আনিসুল হক

জেনারেল ও নারীরা

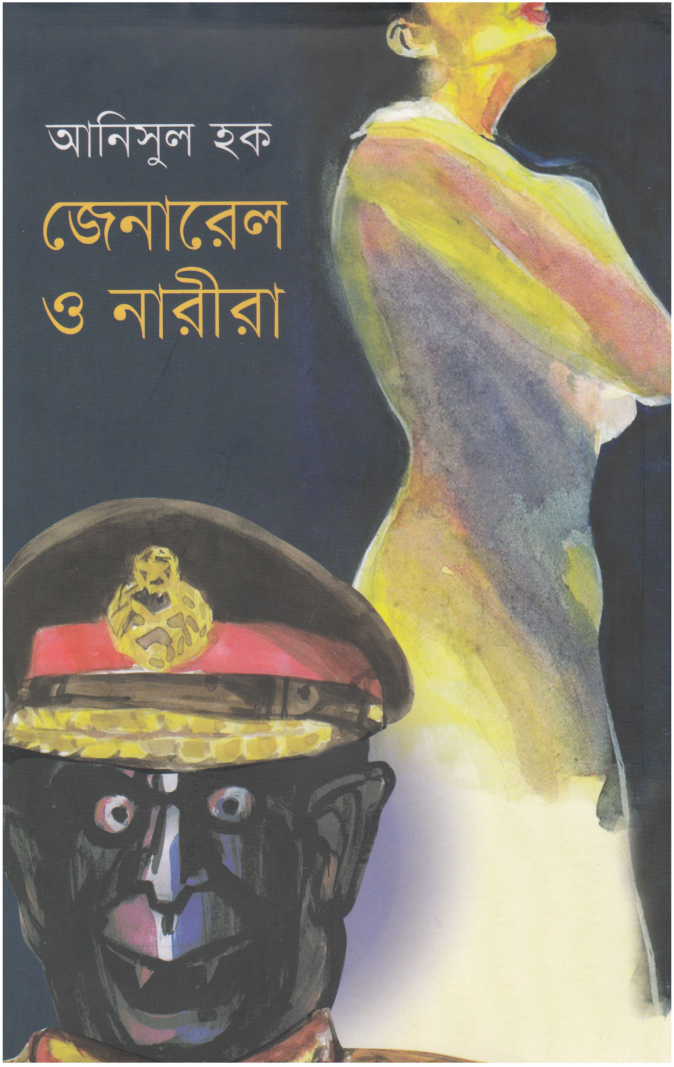

'বারবনিতা আর বেশ্যার দালালদের প্রেসিডেন্ট হাউসে যাতায়াত ছিল অঢেল ও অবাধ। নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার আরকি। তাঁদের কজন আবার বেশ হাই স্ট্যাটাস ভোগ করতেন। ...কুখ্যাত তবে মোহময়ী রমণীদের পাল ঘুরে বেড়াত ভবনের সর্বত্র। তাঁরা ধূমপান করতেন, মদ পান করতেন, নেচে-গেয়ে হেলেদুলে হই-হুল্লোড় করতেন।
পুলিশ বাহিনীতে এসব নিয়ে গোপন হাসি-তামাশার কমতি ছিল না। তারা প্রেসিডেন্ট হাউসের নাম দিয়েছিল কাঞ্জারখানা (পতিতালয়), সামরিক সদর দপ্তরকে দঙ্গরখানা (পশুর আখড়া) আর নিজেদের পুলিশ লাইনকে লঙ্গরখানা (খাদ্যালয়)।'

সরদার মুহাম্মদ চৌধুরী
পাকিস্তান পুলিশের সাবেক আইজি

Prothoma
201602000023
TK. 350.00

পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ছিল অসংখ্য প্রেমিকা। ওই সময় রাষ্ট্রপতি ভবনকে পাকিস্তানের পুলিশেরাই অভিধা দিয়েছিল 'পতিতালয়'। সরকারি রিপোর্টেই শত শত নারীর উল্লেখ পাওয়া যায়, যাঁরা ইয়াহিয়ার কাছে গিয়েছিলেন।

রোম যখন পুড়ছিল, নিরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছিল। আরেক রমণীমোহন পাকিস্তানি পুরুষ ভুট্টোর সঙ্গে মিলে ইয়াহিয়া, তাঁর দোসররা ও তাঁর বাহিনী লাখ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে বাঙালিরা তাদের ন্যায্য দাবি উত্থাপন করেছিল বলে। সেই অন্যায়ে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও তাঁর উপদেষ্টা কিসিঞ্জার। কিন্তু সবাই মিলেও তাঁরা রোধ করতে পারেননি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

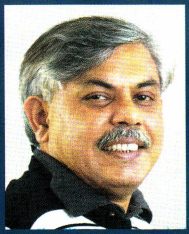

আলোকচিত্র : মাসুদ সরকার

আনিসুল হক

জন্ম ৪ মার্চ ১৯৬৫, নীলফামারী। শৈশব ও বাল্যকাল কেটেছে রংপুরে। পড়েছেন পরীক্ষণ বিদ্যালয় রংপুর, রংপুর জিলা স্কুল, রংপুর কারমাইকেল কলেজ ও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকায়। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনি, শিশুসাহিত্য—সাহিত্যের নানা শাখায় তিনি সক্রিয়। টেলিভিশন নাটক ও চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যও রচনা করেছেন। ২০১২ ও ২০১৩ সালের অমর একুশে বইমেলায় প্রথমা থেকে প্রকাশিত হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও সে সময়ের রাজনীতিবিদদের নিয়ে লেখা উপন্যাসের দুটি পর্ব *যারা ভোর এনেছিল* ও *উষার দুয়ারে*। ২০১৫ সালে বেরিয়েছে *বিক্ষোভের দিনগুলিতে প্রেম*। পেয়েছেন বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ বেশ কয়েকটি পুরস্কার।

প্রচ্ছদ : মাসুক হেলাল

জেনারেল ও নারীরা

আনিসুল হক

জেনারেল ও নারীরা

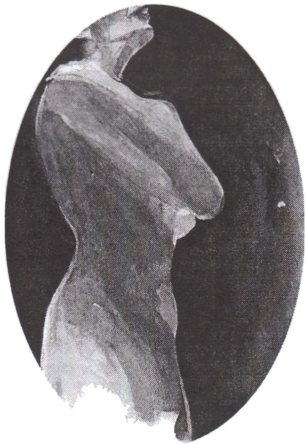

প্রথমা প্রকাশন

জেনারেল ও নারীরা
গ্রন্থস্বত্ব © ২০১৬ আনিসুল হক
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০১৬
মাঘ ১৪২২, ফেব্রুয়ারি ২০১৬
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন
সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ
কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : মাসুক হেলাল
মুদ্রণ : কমলা প্রিন্টার্স
৪১ তোপখানা, ঢাকা ১০০০

মূল্য : ৩৫০ টাকা

General O Narira
A novel in Bangla by Anisul Haq
Published in Bangladesh by Prothoma Prokashan
CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue
Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Telephone: 88-02-8180081
e-mail: prothoma@prothom-alo.info

Price : Taka 350 only

ISBN 978 984 91763 7 4

উ ৎ স র্গ

ইনাম আহমেদ
অসাধারণ লেখক। আমার দুটো উপন্যাস যিনি
ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন।

স্বীকারোক্তি

এই বই লেখার সময় বিভিন্ন বইয়ের সাহায্য নিয়েছি। পত্রপত্রিকা, অনলাইন পত্রিকা ও ব্লগ থেকেও দুহাতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এর একটা তালিকা বইয়ের শেষভাগে দেওয়া হলো।

এ উপাখ্যানের একটা উপজীব্য পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের দুর্বার নারীপ্রীতি। এই বইটি তাই তরুণতর পাঠকদের উপযোগী নয়।

কোনো-না-কোনো সূত্র থেকে তথ্য না পেয়ে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে, প্রায় কিছুই লিখিনি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তুলে দিয়েছি অন্যের লেখা স্মৃতিকথা থেকে, এমনকি পত্রপত্রিকা এবং ব্লগে প্রকাশিত লেখা থেকেও। তার পরও বলব, এটি একটি উপন্যাস, একটি কাল্পনিক আখ্যান।

আনিসুল হক
ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০১৬

স্বয়ং প্রেসিডেন্টের ছিল মদ ও নারীভোগের নেশা। আর তাঁর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্নেল ছিলেন সমকামী...

বারবনিতা আর বেশ্যার দালালদের প্রেসিডেন্ট হাউসে যাতায়াত ছিল অঢেল ও অবাধ। নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার আরকি। তাঁদের কজন আবার বেশ হাই স্ট্যাটাস ভোগ করতেন। আকলিম আখতার, মিসেস কে এন হোসেইন ও লায়লা মুজাফফরের মর্যাদা ছিল সর্বোচ্চ। কুখ্যাত তবে মোহময়ী রমণীদের পাল ঘুরে বেড়াত ভবনের সর্বত্র। তাঁরা ধূমপান করতেন, মদ পান করতেন, নেচে-গেয়ে হেলেদুলে হই-হুল্লোড় করতেন।

পুলিশ বাহিনীতে এসব নিয়ে গোপন হাসি-তামাশার কমতি ছিল না। তারা প্রেসিডেন্ট হাউসের নাম দিয়েছিল কাঞ্জারখানা (পতিতালয়), সামরিক সদর দপ্তরকে দঙ্গরখানা (পশুর আখড়া) আর নিজেদের পুলিশ লাইনকে লঙ্গরখানা (খাদ্যালয়)।

—**সরদার মুহাম্মদ চৌধুরী** (পাকিস্তান পুলিশের সাবেক আইজি)
দি আলটিমেট ক্রাইম, কওমি পাবলিশার্স, ১৯৯৭
অনুবাদ : মশিউর রহমান মহসিন, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন ২০০২।

১৯৪৪ সালে, ইয়াহিয়া ছুটিতে বাড়িতে এসে বিয়ে করেন এক আর্মি অফিসারের মেয়েকে। তাঁদের এক ছেলে এক মেয়ে। দিনে দিনে ইয়াহিয়া বিখ্যাত হয়ে ওঠেন বিশাল এক নারীবাজ হিসেবে। তিনি তাঁর এই কীর্তি গোপন করার চেষ্টা করতেন না। নাইট ক্লাবে তাঁর রক্ষিতাকে বগলদাবা করে প্রকাশ্যে আবির্ভূত হতেন। আমাকে কয়েকজন অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিবাহিত মহিলার দিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে বলা হয়েছিল, এরা সবাই ইয়াহিয়ার রক্ষিতা।

—**আরচার কে ব্লাড**, *দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ*
ইউপিএল, ঢাকা, ২০০২।

শাহেরজাদি বলল, 'সুলতান, ভোর হয়ে আসছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখুন, আকাশ ফরসা হতে শুরু করেছে। বাগানে পাখিরা গান গাইতে শুরু করেছে। কী মধুর এই পাখির কলতান। কী অপরূপ এই ভোরের বাতাস। জানালা-পথে বাতাস আসছে, তার সঙ্গে ভেসে আসছে গোলাপের মিষ্টি গন্ধ। এই পৃথিবীটা সুন্দর। এই পৃথিবী ছেড়ে আমাকে চলে যেতে হবে। একটু পরে আপনার জল্লাদ এসে কতল করবে আমাকে। এই সুন্দর পৃথিবী আমি আর দেখব না। সে জন্য আমার দুঃখ নাই। কিন্তু আমার ছোট বোনটিকে আমি আর দেখব না, এ কথা ভাবতেই আমার দুই চোখ ভরে আসছে জলে। শাহানশাহ, আমার ছোট বোনের নাম দিনারজাদি। ভারী লক্ষ্মী একটা মেয়ে। ওকে ছাড়া আমি একটা দিনও কাটাইনি। ও আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না। বাইরে এসেছে সে। আমার সঙ্গে দেখা করতে। আপনি যদি অনুমতি দেন তো আমি একটিবার তার সঙ্গে দেখা করে আসি। আমি যাব আর আসব।'

সুলতান শাহরিয়ার বললেন, 'নিশ্চয়ই তুমি তোমার বোনের সঙ্গে দেখা করবে। তবে তোমাকে বাইরে যেতে হবে না। সে-ই ভেতরে আসবে। এই ঘরেই তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে।'

শাহেরজাদি বলল, 'তাহলে তো খুব ভালো হয়।'

দিনারজাদি চলে এল। বাদশাহ শাহরিয়ারের উজিরের ছোট মেয়ে। সে এসে বসল তার বোনের পাশে।

বসেই বলল, 'রোজ রাতে তুমি আমাকে গল্প বলে ঘুম পাড়িয়ে দাও। আজ রাতে আমি তোমার গল্প শুনিনি। আমাকে একটা গল্প শোনাও না, বুবু।'

শাহেরজাদি বলল, 'পাগলামো করে না, দিনারজাদি। এটা গল্প বলার জায়গা নয়। এটা গল্প বলার সময়ও নয়। বাদশাহর সময় খুব মূল্যবান। রাত পোহাতেও আর দেরি নাই।'

'না না, আমাকে গল্প তোমার শোনাতেই হবে।' দিনারজাদি কিছুতেই ছাড়বে না।

শাহেরজাদির চোখে জল টলমল করছে। তার নাশপাতির মতো গায়ের রং, বেদানার দানার মতো ঠোঁট, মুক্তার দানার মতো দাঁত, ময়ূরের মতো দুটো টানা টানা মায়াভরা চোখ। সেই চোখে দুই ফোঁটা অশ্রু, ঝাড়বাতির মোমের হলুদ আলোয় সোনার ফোঁটার মতো ঝুলে আছে। সে করুণ কণ্ঠে বলল, 'বাদশাহ, আমি কি আমার বোনকে একটা গল্প বলতে পারি?'

সুলতান বললেন, 'বেশ। শোনাও তোমার গল্প। ছোট বোন শুনবে। আমিও শুনব।'

শাহেরজাদি গল্প বলছে। গল্প বলতে বলতে রোদ উঠল বাইরে। জানালার ভারি মখমলের পর্দা গলে রোদ এসে পড়ল শাহেরজাদির মুখে। তার কাঁচুলির নিচে স্তনাভাস রোদের আলোয় রহস্যহীন দেখাচ্ছে। গল্প তো শেষ হলো না।

সুলতান বললেন, 'শাহেরজাদি, তোমার গল্প আমার খুব পছন্দ হয়েছে। আজকে থাকুক এই পর্যন্তই। বাকিটা কাল শুনব।'

পরের রাতে আবারও শুরু হলো শাহেরজাদির গল্পবলা। সিন্দবাদ ও হিন্দবাদের গল্প, আলিবাবা আর ৪০ চোরের গল্প, আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের গল্প। গল্প বলতে বলতে এক হাজার রজনী গেল কেটে।

সুলতান বললেন, 'তোমার সব গল্প তো শেষ। এবার আমি তোমাকে কতল করব।'

শাহেরজাদি বলল, 'আচ্ছা, আমি আপনাকে ফাকিস্তানের গল্প বলি।'

'ফাকিস্তান? এই নাম তো শুনিনি।'

শাহেরজাদি বলল, 'আমাদের দেশে আমরা বলব পাকিস্তান। কারণ, আমাদের বর্ণমালায় "প" আছে। কিন্তু পাশের দেশ তুরানে যান। সেখানে বর্ণমালায় "প" নাই। আছে "ফ"। কাজেই ওরা পাকিস্তান বলতে পারে না। বলে ফাকিস্তান।'

'ও আচ্ছা। পাকিস্তান। বলো। তবে যে বর্ণমালায় "প" নাই, তারা কিন্তু

অনেক সময় সেটা "ব" দিয়েও চালায়। যেমন পেপসিকে ওরা বলে বেবসি।'

'জি জনাব। তাহলে ওরা, "প"-হীন দেশগুলোর মানুষেরা, পাকিস্তানকে ফাকিস্তানও বলতে পারে, বাকিস্তানও বলতে পারে।'

সুলতান বললেন, 'ইরানে "প" আছে। কাজেই আমরা না-হয় পাকিস্তানই বলি।'

'আপনার মর্জি, জনাব।'

'তাহলে তুমি পাকিস্তানের কিসের গল্প বলবে?' সুলতান বালিশে হেলান দিয়ে বললেন। দিনারজাদি মেয়েটাও দেখা যাচ্ছে এই হাজার দিনে বেশ লায়েক হয়ে উঠেছে।

'ইয়াহিয়ার গল্প বলি', সুলতান শাহরিয়ারকে ভোলানোর জন্যই বোধ হয় তড়িঘড়ি করে বলল শাহেরজাদি।

সুলতান বললেন, 'সে আবার কে?'

শাহেরজাদি বলল, 'সে আপনার ওই ফাকিস্তান ওরফে বাকিস্তান ওরফে পাকিস্তানের এক রাষ্ট্রপতিত।'

'রাষ্ট্রপতিত! এই রকম তো কখনো শুনিনি।'

'জি, শাহানশাহ। রাষ্ট্রপতিত। আসলে রাষ্ট্রপতি। কিন্তু আমি তাঁকে রাষ্ট্রপতিত বলি। কেন বলি, সেটাও আপনাকে বলছি। তাঁর নাম ইয়াহিয়া।'

'আচ্ছা।'

'আপনি তো রোজ একজন করে কুমারীর সঙ্গে রাত কাটাতেন, আর তিনি কিনা রোজ একাধিক নারীর সঙ্গে সময় কাটাতেন। আপনি তো শুধু রাতটাই কাটান, দিনে ব্যস্ত থাকেন বাদশাহি নিয়ে, আর তিনি কিনা দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টাই কাটাতেন মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে। ৩৫০ দিনে তাঁর সঙ্গে সময় কাটিয়েছেন অন্তত পাঁচ শ নারী।'

'আরেব্বাস। এ তো কাম-আল আছে।'

'জি, জনাব। বড়ই কামের।'

'হুম।'

'আমি তাঁর গল্প শুরু করি।'

'করো। আগে তুমি আমাকে বলো, রাষ্ট্রপতি না বলে তাঁকে তুমি

রাষ্ট্রপতিত বলছ কেন?'

'কারণ তাঁর যে প্রাসাদ, যাকে লোকের বলা উচিত রাষ্ট্রপতি-আলয়, তাঁর নিজের বেতনভুক পুলিশেরাই সেটাকে ডাকত "পতিতালয়" বলে। কথাটা কী দাঁড়াচ্ছে ভাবুন। রাষ্ট্র-পতিতালয়। তাহলে তিনি কী হলেন। রাষ্ট্রপতিত।'

সুলতান শাহরিয়ার হাসলেন। খিলখিলিয়ে। তাঁর হাসিতে শাহেরজাদির মুখে হাসি ফুটে উঠল! শাহেরজাদির বুকের ওড়না গেল সরে। স্তন দুটো মেঘের আড়ালে উঁকি দেওয়া দুটো চাঁদের মতো। শাহরিয়ার ভাবলেন। এবং এ-ও ভাবলেন, আকাশে কেন মাত্র একটা চাঁদ। চাঁদ অবশ্যই দুটো থাকা উচিত ছিল।

শাহেরজাদি তার গল্প শুরু করল।

রাষ্ট্রপতিতালয়, পিন্ডি, ১৯৭১

পিন্ডির রাষ্ট্রপতিতালয়, যেখানে পতিতাগণের অবাধ আসা-যাওয়া, সেখানে ড্রেন দিয়ে পানি প্রবাহিত হয় না, বয়ে চলে মদের ধারা। সারাক্ষণ ভুরভুর করে মদের গন্ধ বেরোচ্ছে ড্রেন থেকে, ঘর থেকে, টেবিল থেকে, বেশ্যাদের মুখ থেকে, রাষ্ট্রপতিতের মুখ থেকে, মেহমানদের মুখ থেকে। ড্রেনে এত মদ বয়ে যায় যে, ওখানকার ড্রেনের পোকাগুলো পর্যন্ত হাঁটতে পারে না, টলমল করে তাদের পা, মাছিরা উড়তে পারে না, মদালস পাখা কীভাবেই বা মেলবে তারা। সুবিস্তৃত বাগান আছে রাষ্ট্রপতিতালয়ের সামনে-পেছনে, সেখানে ফুলের গন্ধ নাই, আছে তামাকের ধোঁয়া। যৌনকর্মীরা সারাক্ষণ আসছে, যাচ্ছে; তাদের গা থেকে বেরোচ্ছে হালাল সুগন্ধি, যারা সারাক্ষণ ডুবে আছে মদে আর তামাকের ধোঁয়ায়, সুগন্ধিতে মদ থাকলে তাদের আবার চলে না, কারণ তারা হারাম পারফিউম গায়ে মাখতে পারে না, তারা ব্যবহার করে হালাল আতর। ফাকিস্তানের রাজধানী পিন্ডি। রাষ্ট্রপতিত থাকেন রাষ্ট্রপতিতালয়ে।

ইয়াহিয়া এখন তাঁর কক্ষে। সেগুন কাঠের কারুকার্যময় দরজা ভেতর থেকে আটকানো। বাইরে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন রাষ্ট্রপতিতালয়ের কর্মকর্তারা।

সুলতান শাহরিয়ার বললেন, 'তোমাকে বারবার করে ফাকিস্তান,

বাকিস্তান, রাষ্ট্রপতিতালয় বলতে হবে না। তুমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে যাও। তুমি পাকিস্তান বললেও আমরা বুঝব তুমি ফাকিস্তানের কথাই বলছ। তুমি প্রেসিডেন্ট বললেও আমরা বুঝব তুমি বোঝাচ্ছ রাষ্ট্রপতিত। হা হা হা।'

শাহেরজাদি তার গল্প বলে চলেছে :

ক্রিং ক্রিং। ফোন বাজছে।

সামরিক সচিব জেনারেল ইসহাক ফোন ধরলেন, 'এমএস বলছি।'

'প্রেসিডেন্ট কি বেরিয়েছেন? শাহ এখনি বেরোবেন। তাঁকে ফেয়ারওয়েল দিতে হবে। অলরেডি আমরা লেট।'

'প্রেসিডেন্ট বের হননি।'

'কখন বের হবেন?'

'বলা মুশকিল। তিনি তাঁর ঘরে। তিনি ঘর থেকে বের হচ্ছেন না।'

'এগিয়ে যান। তাঁকে ডাকুন। এটা রাষ্ট্রীয় প্রোগ্রাম। ইরানের শাহর ফ্লাইট ছেড়ে দেবার সময় পার হয়ে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট কখন আসবেন আর কখনই বা ইরানের শাহকে বিদায় জানাবেন?'

'কিন্তু আমরা কী করব? প্রেসিডেন্টের ঘরে তাঁর অতিথি আছেন।'

'প্রেসিডেন্টের ঘরের দরজা কি ভেতর থেকে বন্ধ?'

'তা তো জানি না।'

'গিয়ে ধাক্কা মারুন।'

'সেটা তো সম্ভব না।'

ক্রিং ক্রিং।

'প্রেসিডেন্ট কি বেরিয়েছেন?'

ক্রিং ক্রিং। 'প্রেসিডেন্ট কি বেরিয়েছেন?'

ক্রিং। ক্রিং।

ক্রিং ক্রিং। 'প্রেসিডেন্ট কি বের হয়েছেন?'

ক্রিং ক্রিং। 'জি না, বের হননি। জি, আমি দেখছি কী করা যায়?'

প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব জেনারেল ইসহাক কী করতে পারেন?

কিন্তু এতবার ফোন আসছে। পররাষ্ট্রবিষয়ক কর্তারা এত অস্থির হয়ে গেছেন—তাঁর একটা কিছু করা দরকার।

প্রেসিডেন্টকে ডিস্টার্ব করা যাচ্ছে না, কারণ তাঁর কক্ষে নুরজাহান। পাকিস্তানের মালিকা ই তারান্নুম। প্রেসিডেন্ট যাঁকে আদর করে ডাকেন

নুরি। গায়িকা এবং নায়িকা।

জেনারেল ইসহাক মুশকিলে পড়লেন। একটা উপায় হলো প্রেসিডেন্টের ফোনে কল দেওয়া। কিন্তু দেবেটা কে? কার ঘাড়ে দুইটা মাথা।

উপায় নাই। জেনারেল ইসহাক তাঁর টেবিলের ওপরের লাল রঙের ফোনটা তুললেন। নম্বরে আঙুল দিয়ে ডায়াল ঘোরালেন। রিং হচ্ছে। কেউ ধরছে না।

জেনারেল ইসহাক বিপন্ন। প্রেসিডেন্ট হাউসের স্টাফরা সবাই দাঁড়িয়ে আছে, কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

মহা কেলেঙ্কারি হতে যাচ্ছে। পিআইএর বিমানটা পিন্ডি এয়ারপোর্টে প্রস্তুত। ইরানের শাহ তাঁর লটবহর নিয়ে তৈরি হয়ে বসে আছেন। এখন প্রেসিডেন্ট যদি না বেরোন, তাহলে সারা পৃথিবীকে মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না।

হঠাৎ জেনারেল ইসহাকের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। তাঁর মনে একটা আশার সঞ্চার হয়েছে। তিনি একটা আলোর রেখা দেখতে পেলেন। একমাত্র জেনারেল রানি পারেন তাঁকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে।

রানির বালামখানা খুব দূরে নয়। জেনারেল ইসহাক মোটরগাড়িতে ছুটলেন সেই বালামখানার দিকে। দ্রুত ঢুকে গেলেন বাড়িতে। বাড়ির বাইরে পুলিশ প্রহরীরা জেনারেলের গাড়ি দেখে তাঁকে ঢুকতে দিল বিনা বাক্যব্যয়ে। এই প্রমোদকুঞ্জেও নানা জাতের জেনারেলরা সব সময়ই আসা-যাওয়া করেন। তাঁদের ঢুকতে দেওয়াই দস্তুর।

জেনারেল ইসহাক বললেন, 'মাতাজি, আপনাকে এক্ষুনি আমার সঙ্গে যেতে হবে।'

তাঁকে ডাকা হয় জেনারেল রানি বলে। রানি পরে আছেন একটা আঁটসাঁট কামিজ, নিচের দিকে ঢোলা ওপরের দিকে চিপা একটা সালোয়ার। তাঁর ওড়না হাতে, ওড়নার দুই প্রান্ত পায়ের দিকে গড়াচ্ছে। তাঁর ঠোঁট লাল, তাঁর হাত ভরা সোনার বালা।

রানি বললেন, 'তবিয়ত ঠিক আছে?'

'জি?' জেনারেল ইসহাক চমকে উঠলেন।

'শরীর ঠিক আছে?'

'জি।'

'কোনো বিমার হয়নি তো?'

'জি না।'

'তাহলে মাথা ঠিক নাই।'

'তা একটু খারাপ আছে।' ইসহাক মাথা চুলকে বললেন।

'আমি সেটা শুরুতেই বুঝেছি—আমি কারও মাতাজি হই না। আমি সবার বন্ধু।'

জেনারেল ইসহাক মনে মনে বললেন, ছ-ছটা সন্তানের মা হয়েও তুমি কারও মা হও না। বটে। তবে তুমি আজকে আমার মায়ের চেয়েও বড় উপকারটা করতে পারো।

'আপনাকে এক্ষুনি প্রেসিডেন্ট হাউসে যেতে হবে। প্রেসিডেন্ট দরজা বন্ধ করে আছেন। দু-চারবার টোকা দেওয়া হয়েছে। বার তিনেক ফোন করেছি। তিনি কিছুতেই সাড়া দিচ্ছেন না। এদিকে রাষ্ট্রীয় প্রটোকলের ডাক। ইরানের শাহকে বিদায় দিতে হবে। আপনি আমার সঙ্গে চলুন। প্রেসিডেন্টকে বের করে আনুন।'

রানি হাসলেন। বললেন, 'একটা মিনিট। আমার আগা জানির সঙ্গে দেখা করতে যাব। আমাকে একটু পোশাকটা পাল্টাতে দিন। একটু সাজতে দিন।'

'মাতাজি, আজকে আপনাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। আপনাকে একদম সাজতে হবে না। এই পোশাকটা তো খুবই শানদার। আপনাকে সেই রকম গর্জিয়াস লাগছে।'

'দুষ্টু ছেলে। তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

রানি সাজপোশাকে বেশি সময় নিলেন না। তিনি নিজেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বন্ধু বলে মনে করেন। বন্ধুর কাছে যাওয়ার জন্য তাঁর বেশি প্রসাধনের দরকার নাই।

কিন্তু তিনি জানেন, যে-নারীর প্রধান অস্ত্র তার শরীর, সে কোনো নারীই নয়। তারা বসন্তের ফুলের মতো। ফোটে এবং ঝরে পড়ে। তিনি কত জেনারেল, কত নেতা, কত অফিসারকে মেয়ে সরবরাহ করেন। কোনো মেয়েই তো কারও জীবনে স্থায়ী আসন গাড়তে পারল না। কিন্তু তিনি, রানি, জেনারেল রানি, রয়েই গেছেন। মক্ষীরানির মতো তাঁকে ঘিরেই

সব। মেয়েরা সবাই ফুলের মতো হতে চায়। কিন্তু তাদের হতে চাওয়া উচিত কদবেলের মতো। বাইরেরটা শক্ত। ভেতরে মধু। ফুল ফোটে ঝরে যায়, দুনিয়ার রীতি। আজ যার শুরু হয়, কাল তার ইতি। কিন্তু ফল দুদিনের জন্য ফোটে না। বোঁটা ধরে অনেকক্ষণ ঝুলে থাকে।

জেনারেল ইসহাকের জিপেই উঠলেন রানি। গাড়ি ছুটতে শুরু করল। পেছন পেছন তাঁর নিজের গাড়ি এল প্রেসিডেন্ট হাউস পর্যন্ত। তাঁর গাড়ি এই বাড়িতে সকাল-বিকাল আসে। প্রাসাদের গেটে এই গাড়ি আসামাত্রই ভেতর থেকে দরজা খুলে যায়।

রানি নামলেন রাষ্ট্রপতির খাস কামরার খুব কাছের পোর্চে। তাঁদের জিপ সেখানে পৌঁছামাত্র আর্দালিরা দৌড়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল।

জেনারেল ইসহাকও লাফ দিয়ে নামলেন জিপ থেকে। রানির হাত ধরে তাঁকে নিয়ে ছুটতে লাগলেন খাস কামরার দিকে।

তখনই, একটা দমকা হাওয়া এসে উড়িয়ে দিল রানির ওড়নাখানি।

রানি এই বাতাসটাকে চেনেন। এ হলো তাঁর সৌভাগ্যের হাওয়া। একদিন এমনই বাতাস ভেসে এসেছিল মারি পাহাড়ের তুষারশীতল চূড়া থেকে। সে আজ থেকে সাত বছর আগের কথা। আপাদমস্তক তিনি আবৃত ছিলেন বোরকায়। সেই হাওয়া তাঁর মুখের নেকাব দিল উড়িয়ে। ছটি সন্তানের মা আকলিম, তখনো তিনি রানি হননি, তখনো তিনি গুজরাটের সম্পন্ন ঘরের মেয়ে আকলিম, যাঁর বিয়ে হয়েছে পুলিশ কর্মকর্তার সঙ্গে, যিনি একের পর এক বাচ্চা বিয়োয়ে চলেছেন।

তাঁর পুলিশ স্বামী বললেন, 'এটা কী ধরনের নাফরমানি। মুখের নেকাব কেন সরবে? তোলো নেকাব।'

পাইনগাছের সারির নিচে পর্যটকের মন আর ফুর্তি নিয়ে হাঁটছিলেন আকলিম, ঠান্ডা হাওয়া তাঁর মুখে যেন স্নেহমাখা হাত বোলাচ্ছে, মুখের পর্দা সরিয়ে এতই ভালো লাগছিল তাঁর, স্বামীর কথায় আমল দিলেন না, খিলখিল করে হেসে উঠে পাশের ঝাউগাছের পাতায় হাত বোলাতে লাগলেন।

'এ কী করছ তুমি? মুখ ঢাকো বলছি। রাস্তায় কত মানুষ। এটা মলে যাওয়া-আসার পথ।'

আকলিম তখন ঘুরে দাঁড়ালেন স্বামীর দিকে। আস্তে আস্তে চিবুকের

নিচে বোরকার ফিতাটা খুললেন। তারপর বোরকাটা পুরোটাই খুলে ছুড়ে মারলেন স্বামীর মুখের দিকে।

তারপর হাসতে লাগলেন খিলখিল করে।

হাওয়া বইছে। সেই মত্ত হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে গেল বোরকাখানি। ঝাউগাছের ওপর দিয়ে উড়ে গেল পাহাড়ের শানুদেশে। কোন অতলে, কোন গহিনে! চোখের আড়ালে।

পুলিশ স্বামী ভীষণ চটেমটে লাল। দূর পাহাড়ের গায়ে অস্তগামী সূর্যের লালও যেন হার মানবে স্বামীর রক্তিমাভ মুখের কাছে।

আকলিম বললেন, 'আর কোনো দিনও আমি এই বোরকা পরছি না।'

স্বামী বললেন, 'আর কোনো দিনও তুমি আমার ঘরে জায়গা পাচ্ছ না।'

তিনি তাঁর হাতের ছড়ি দিয়ে আঘাত করলেন আকলিমকে। তিনি হাত বাড়িয়ে মুখটা বাঁচালেন। কিন্তু তাঁর বাহুতে এসে লাগল ছড়ির বাড়ি। জায়গাটা ফুলে গেল। এক মুহূর্তে কালো হয়ে গেল হাতের মার-খাওয়া জায়গাটা।

আকলিম বললেন, 'আমি তোমার ঘরে আর কোনো দিনও ফিরছি না।'

রাগে তাঁর সমস্ত সত্তা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি গিয়ে তিনি ওই বাবার বয়সী লোকটার মাফলার কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলেন, তাঁর মুখ আঁচড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দেন। কিন্তু রাস্তাটা গিয়ে মিলেছে মলে, লোকজন হাঁটাহাঁটি করছে, তাদের সামনে এই লোকটাকে মারধর করাটা ঠিক হবে না।

তাঁরা ছুটি থেকে ফিরলেন তাড়াতাড়ি। আকলিম তাঁর ছ'টি বাচ্চা নিয়ে বেরিয়ে গেলেন স্বামীর ঘর থেকে। সেই যে বেরোলেন, আর ফিরলেন না।

সেই হাওয়াটাই যেন আজকে বইছে রাষ্ট্রপতিতালয়ে। তাঁর সৌভাগ্যের বাতাস।

যে স্বামীকে তিনি ছেড়ে এসেছেন, সেই পুলিশ-কর্তা কোথায় পড়ে রইলেন, কোন অজানা অন্ধকারে! আর তিনি কোথায়? আকলিম থেকে তিনি আজ রানি। জেনারেল রানি। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর দহরম-মহরম।

অবশ্য পুলিশ-কর্তা স্বামীর সঙ্গে থাকার অতীত অভিজ্ঞতা তাঁর জীবনে কাজে লেগেছে। স্বামীর সূত্রেই তিনি দেখেছেন দেশের বহু ক্ষমতাবানকে। বুঝেছেন, এঁরা দেশের জন্য খাটতে খাটতে এতই হয়রান যে, এঁদের

দরকার হয় একটুখানি আমোদ-ফুর্তি। তা না হলে এঁরা দেশের জন্য কাজ করবেন কী করে? এই জন্য এঁদের দরকার হয় মেয়েমানুষ। সেই রকম মেয়েমানুষ, যাদের ওপর নির্ভর করা যায়। যারা গোপনীয়তা বজায় রাখবে, আর যাদের আছে আভিজাত্য। আকলিম সেই রকম মেয়েমানুষদেরই জড়ো করেছেন। কাকে কার কাছে পাঠাতে হবে, এটা তাঁর মতো আর কেউ ভালো জানে না, পারেও না।

পুরুষমানুষের হাতেই যত ক্ষমতা। কিন্তু সেই ক্ষমতার খেলায় পুরুষকে বন্দী করতে পারে একমাত্র মেয়েমানুষ। পুরুষের সমস্ত ক্ষমতাবুদ্ধি লোপ পাবে, যদি তার দু'পায়ের জোড়ের ওই জায়গাটার তুমি দখল নিতে পারো। পুরুষদের খেলায় পুরুষদের নিয়ম দিয়ে তিনি পুরুষদের ঘায়েল করতে সক্ষম হয়েছেন।

কত কত জেনারেল, রাজা-উজির, অফিসার, ব্যবসায়ী আজ তাঁর পায়ের কাছে এসে বসে থাকে। তাঁর একটুখানি নেক-নজরের আশায়।

কাজটা শুরু করতেও আকলিম আখতারকে বুদ্ধি খাটাতে হয়েছিল। তিনি করাচি, রাওয়ালপিন্ডি, লাহোরের নাইট ক্লাবগুলোতে যাওয়া শুরু করেছিলেন। না গিয়ে তাঁর কোনো উপায় ছিল না। ঘরে তাঁর ছয়টা মুখ। তাদের পেট ভরাতে হয় তাঁকেই। সেসব নাইট ক্লাবেই তিনি দেখা পান জেনারেলদের, সরকারি অফিসারদের আর ব্যবসায়ীদের। তিনি বুঝতে পারেন, এঁদের জন্য করাচির ন্যাপিয়ের রোড কিংবা লাহোরের হীরা মান্ডির মতো বেশ্যাপাড়া দিয়ে চলবে না। এঁরা এত ছোট নন যে বাজারি মেয়েমানুষের কাছে যাবেন। এঁদের দরকার হবে উঁচু শ্রেণির ভদ্রমহিলা। আকলিম রাওয়ালপিন্ডি গেলেন। সেখানকার সবচেয়ে দামি ও বিখ্যাত নাইট ক্লাবটির পাশেই তিনি একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করলেন। সেখান থেকেই তাঁর সৌভাগ্যের সূত্রপাত। ওই ফ্ল্যাটে ক্ষমতাবানেরা আসতে শুরু করলেন। তিনি তাঁদের দিলেন অভয়ারণ্যের নিরাপত্তা আর নিশ্চিতি। দিলেন স্বর্গের সুখ—শরাব আর সাকি।

ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখার দিনটিতেও বইছিল সৌভাগ্যের বাতাস।

শিয়ালকোটের হাসপাতালে। ডেটলের গন্ধ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল বাগান

থেকে ভেসে আসা গোলাপ ফুলের গন্ধযুক্ত বসন্ত বাতাস।

কেবিনে ছিলেন তিনি। পেটে ব্যথা নিয়ে ভর্তি হয়েছিলেন।

ডাক্তার প্রথমেই বলল, 'মাসিক বন্ধ হয়নি তো?'

শুনে আকলিম আঁতকে উঠেছিলেন। স্বামী পরিত্যক্তা জীবনে তিনি এই সব ঝামেলায় পড়তে চান না।

তিনি বললেন, 'ব্যথা হয় পেটের ডান দিকে।'

'তাহলে অ্যাপেন্ডিসাইটিস হওয়ার আশঙ্কা বেশি।'

'অ্যাপেন্ডিসাইটিস?'

'অপারেশন না করলে অ্যাপেন্ডিস পেটের ভেতরেই যাবে ফেটে।'

ভর্তির পরই এক্স-রে, ব্লাড টেস্ট নানা কিছু করা হতে লাগল। সেসবের রিপোর্ট আসার আগেই ব্যথা গেল সেরে। কিন্তু আকলিম তখনো কেবিনে বন্দিনী।

ইয়াহিয়া খান তখন ওই অঞ্চলের কমান্ডিং অফিসার। হাসপাতাল পরিদর্শনে এসেছেন। কেবিনের বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন আকলিম। একটা লাল রঙের কামিজ পরা ছিলেন, ইয়াহিয়া খান পরে তাঁকে বলেছিলেন, তাঁর মনে হয়েছিল, বারান্দায় গোলাপ ফুটে আছে—বসরার গুলবাগানের গোলাপ।

ইয়াহিয়া খান পূর্ণ চোখে তাকিয়ে আছেন আকলিমের দিকে, আর আকলিমও তত দিনে জেনে গেছেন, কোনো পুরুষকে পটাতে হলে তার চোখের দিকে তাকাতে হয়, তাকিয়ে হাসি দিতে হয়, হেসে লজ্জা পেতে হয়, কিন্তু চোখ সরাতে হয় না।

ইয়াহিয়া খান চলে এলেন তাঁর কাছে।

জিগ্যেস করলেন, 'কেমন আছেন? হাসপাতালে আপনার যত্ন ঠিকভাবে নেওয়া হচ্ছে তো?'

আকলিম বললেন, 'একটু বেশিই যত্ন নিচ্ছে। আপনি নিশ্চয়ই জানেন, অনেক বেশি যত্ন অনেক সময় মনে হয় জিঞ্জির। পাখি খাঁচার যত্ন চায় না, চায় খোলা আকাশ!'

ইয়াহিয়া খান বললেন, 'আপনার কথা আপনার চেহারার মতোই সুন্দর। যেন কবিতা।'

আকলিম বললেন, 'হ্যাঁ। এটা কবিতাই। আমার নিজের লেখা।'

ইয়াহিয়া খান বললেন, 'আপনার কবিতা তো তাহলে শুনতে হয়।'

আকলিম বললেন, 'বাঁদি সে সুযোগ পেলে ধন্য হয়ে যাবে।'

হাওয়া বয়, হাওয়া ঝাপটা দেয়, বুকের দোপাট্টা খসে পড়ে, বাগানের গোলাপ তার সুগন্ধিতে মাতিয়ে তোলে হাসপাতালের বারান্দা, কেবিন, ওয়ার্ড, চত্বর।

ইয়াহিয়া ভাবেন, আমার বড়শিতে এইমাত্র একটা মাছ গাঁথা হয়ে গেল।

আকলিম ভাবেন, তোমাকে গেঁথে ফেলেছি, আগাজি, তুমি আবার আমার কাছে আসবে। সুতোয় টান দেওয়া মাত্র।

নারী-পুরুষের জঙ্গলে কে যে শিকার আর কে যে শিকারি! শিকারের এই খেলায় তা স্পষ্ট নয়। এখানে বাঘ তার বুক পেতে দেয় বন্দুকের সামনে, আর শিকারি তার মাথা ঢুকিয়ে দেয় বাঘের হাঁয়ের মধ্যে।

শিকার ও শিকারির এই খেলায় ভূমিকা রাখল ভবিতব্যও।

পিন্ডি ক্লাবের শৌচালয়ের কাছে বসে ছিলেন আকলিম।

ওখানেই একটা কুর্শিতে জায়গা হলো তাঁর। জায়গাটা অন্য কোনো নারী পছন্দ করবে না। শরীর আছে যেসব নারীর, আছে চেহারা, আছে স্তনসম্পদ, নিতম্বভান্ডার, আছে মধু-উপত্যকা—তারা ঢলে পড়ছে ওই নৃত্যগীতময় বলরুমে, ঢলছে, দুলছে, নাচছে, গাইছে। কিন্তু তাঁর তো কেবল শরীর নয়, আছে বুদ্ধিও। ওই মাতাল ক্ষমতাবানদের সঙ্গে নাচানাচি করে, অতঃপর তাদের অঙ্কশায়িনী হলে তুমি বড়জোর আয় করবে কয়েক হাজার, কিন্তু কয়েক লাখ আয় করতে হলে শৌচাগারের পাশের এই অলিন্দের এই নির্জন কুর্শিটাই উত্তম স্থান।

ক্লাবে আসা মরদগুলো নাচছে, গাইছে, মদ্যপান করছে, রমণীদের দেহের উষ্ণতায় উষ্ণ হচ্ছে, সান্নিধ্যে মৌজ পাচ্ছে, আর তাদের কিডনি বারবার করে ভরে যাচ্ছে বলে তাদের আসতে হচ্ছে শৌচাগারের দিকে।

আসছেন আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান। খারিয়ানে তাঁর পোস্টিং। পিন্ডি ক্লাবে এসেছেন, পুরো মজে আছেন, আকণ্ঠ পান করেছেন, তাঁর পা টলছে, তাঁর হাত কাঁপছে। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি ঠিক আছে। বারবার করে আসছেন, আর চোখ রাখছেন আকলিমের দিকে।

বললেন, 'আপনাকে কোথায় দেখেছি বলুন তো! শিয়ালকোটের হাসপাতালে না?'

'ঠিক মনে রেখেছেন তো!'

'আপনার নাম আকলিমা?'

'আকলিমা নয়। আকলিম। কিন্তু একই কথা। আমি কৃতার্থ যে আপনি আমার নাম মনে রেখেছেন।'

'আমি শুধু আপনার নাম নয়, আপনার সবকিছুই মনে রেখেছি। আমি সৌন্দর্যের তারিফ করতে জানি। সৈনিক হলেও আমার মনটা সৌন্দর্যপিপাসু।'

'আর আমিও সৌন্দর্যপিপাসুদের ভালোবাসি। তাদের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য আমি সবকিছু করতে পারি। কিন্তু তাকে হতে হবে পূজারি। ফুলবনে মত্ত হস্তী আমার পছন্দ নয়।'

'আমি হস্তী নই। আমি ভ্রমর। আমি গুনগুন করে গান করি আর ফুলের সৌন্দর্যের তারিফ করি।'

'আর সেই তারিফ শুনে ফুল তার মধুভাণ্ড মেলে ধরবে আপনার জন্য। আপনি আমার গরিবখানায় একটু তকলিফ নেবেন।'

ইয়াহিয়া খানই যোগাযোগ করলেন আকলিমের সঙ্গে।

আকলিম তখন তাঁর ফ্ল্যাটবাড়িতেই ছিলেন।

তখনই এল ফোন।

আকলিম ফোন ধরলেন।

'হ্যালো, আকলিম আখতার বলছেন?'

'জি, জনাব।'

'আমি ইয়াহিয়া।'

'আগাজি। আপনি ফোন করেছেন! নম্বর পেলেন কোথায়?'

'আন্তরিকভাবে চাইলে পৃথিবীর যেকোনো কিছুই কি পাওয়া যায় না?'

'তা ঠিক। তবে আমি তো এই বাসায় থাকি না। মাঝেমধ্যে আসি।'

'হ্যাঁ। আমি আরও দুবার আপনাকে কল করেছিলাম। পাইনি। তৃতীয়বারের চেষ্টায় পেলাম।'

'হায় খোদা। আমি আপনাকে এত কষ্ট দিয়েছি!'

'না, কষ্ট কিসের!'

'কষ্ট করেছেন। এবার আমি আপনার সেবা করে তা শোধ করে দিতে চাই। আপনি কি দয়া করে একবার এই বাড়িতে পদধূলি দেবেন!'

ইয়াহিয়া বেশি দেরি করেননি আকলিমের আতিথ্য গ্রহণ করতে।

তাঁকে তিনি বাইরের ঘর থেকে নিয়ে গেলেন ভেতরের ঘরে। সেখানে তাকিয়ার পাশে বই। বারান্দায় টবভরা গোলাপ। আকলিম আগাজির জন্য সাজিয়ে রেখেছিলেন সবচেয়ে দামি স্কচ হুইস্কি। রুপার গেলাসে, পরিপাটি করে সাজিয়ে, বাদাম আখরোট-সহযোগে তিনি নিজ হাতে পরিবেশন করলেন সেই শরাব।

শোনাতে লাগলেন নিজের লেখা শের:

'প্রিয়তম, তোমাকে আমি যখন মদ ঢেলে দিই,
তখন জেনে রেখো, আমার নিজেকেই আমি ঢেলে দিই গেলাসে।'

নাচ আর গানের ব্যবস্থা ছিল। আকলিম তাঁর সংগ্রহের সবচেয়ে নিপুণা তরুণীটিকেই আনলেন ইয়াহিয়ার সম্মানে। তামান্না নামের আঠারো বছরের মেয়েটি যেমন ভালো নাচতে পারে, তেমনি পারে ইংরেজিতে কথা কইতে।

আগাজি সেদিন পরে এসেছিলেন লম্বা কোর্তা আর সালোয়ার। তা ছিল সাদা রঙের। তাঁর ভরাট মুখখানি আকলিমের কাছে মনে হয়েছিল পূর্ণ চাঁদের মতো। মনে হচ্ছিল, শরতের আকাশে সাদা মেঘের ফাঁকে উদিত হয়েছে গোল চাঁদ। আকলিম মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছিলেন আগাজির মুখের দিকে। ইয়াহিয়া নাচ দেখছিলেন, গান শুনছিলেন, তাঁকে মদ ঢেলে দিচ্ছিলেন আকলিম, নিজের হাতে, কিন্তু তাঁর চোখ ছিল ইয়াহিয়ার চোখের দিকে। ইয়াহিয়ার চোখ উঠছে-নামছে, তিনি তামান্নার চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন, মুখের দিকে, বুকের দিকে, নাভির দিকে, তামান্নার ঘাগরা সরে গেল, তাঁর ঊরুতে আছড়ে পড়ছে ঝাড়বাতির আলো, ইয়াহিয়ার চোখ নামল, তামান্না কার্পেটে বসে পড়েছে, তাঁর বুক উপচে পড়ছে কাঁচুলি থেকে, তামান্নার স্তন তত বড় নয়, ইয়াহিয়ার চোখ নিচে, তারপর তামান্না উঠল, ইয়াহিয়া হাত বাড়িয়েছেন আকলিমের দিকে, আকলিম তাঁর হাত মুঠোয় পুরলেন, তারপর ইয়াহিয়ার হাত তাঁর পিঠে, তারপর তাঁর চোখ চলে এল আকলিমের দিকে, আকলিম চোখ সরাচ্ছেন না। আকলিম

জানেন, মেয়েদের সবচেয়ে বড় যৌনাস্ত্র হলো চোখ। গ্রামোফোনে গান বাজছে...উর্দু ছবির গান...খাড়ি নিম কে নিচে। ইয়াহিয়া আকলিমকে কাছে টেনে নিলেন। আকলিম তাঁর কানের কাছে মুখ নিয়ে বললেন, 'আমি আপনার কত কাছে, তবু কত দূর'...ফিসফিসিয়ে বললেন, নিজের লেখা শায়েরি থেকে, তাঁর কথার সঙ্গে শ্বাস মেশানো, সেই শ্বাস উষ্ণ, ইয়াহিয়ার কানে তা দিল গরম ভাপ, আকলিমের শরীরও উষ্ণ, একটা কবুতরের বুকের মতো নরম আর উত্তপ্ত, ইয়াহিয়া গেলাসে আরেকটা চুমুক দিলেন। তারপর শরাব এগিয়ে দিলেন আকলিমকে। আকলিম বললেন, 'আমি আলাদা গেলাসে নিচ্ছি, আগাজি।'

ইয়াহিয়া বললেন, 'কেন? আলাদা গেলাসে নিতে হবে কেন?'

আকলিম বললেন, 'ওটা আপনার গেলাস। আপনার গেলাসে চুমুক দেওয়া আমার জন্য হবে বেয়াদবি।' তিনি হাত বাড়িয়ে আরেকটা গেলাসে হুইস্কি ঢেলে নিলেন নিজের জন্য।

ইয়াহিয়া ধরে আসা গলায় বললেন, 'আমার গেলাস থেকে শরাব নিলে সেটা তোমার জন্য বেয়াদবি হবে? কিন্তু তোমার ঠোঁট থেকে আমি যদি মদিরা নিই, তাহলে তো কোনো বেতমিজি হবে না।' তিনি আকলিমের মুখে মুখ লাগিয়ে ভেতরের শরাব নিজের মুখে শুষে নিতে লাগলেন। এত স্বাদু মদিরা তিনি এর আগে আর কখনো পান করেননি। 'এটা হলো পৃথিবীর সবচেয়ে সুস্বাদু শরাব', তিনি আকলিমের কানে মুখ দিয়ে বললেন।

'শুকরিয়া আগাজি!'

'আগা জি নয়, বলো আগা জানি।'

'আগা জানি, আপনি এই পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর মানুষ, আপনি দেবদূতের মতো'...আকলিমের শ্বাস ঘন হয়ে আসছে।

গ্রামোফোনে গান বেজেই চলেছে, তামান্নার উরু যেন মোম, আলো ঝলকাচ্ছে, আর তাঁর গানের কাহিনিতে বিবৃত নিমগাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা নারীটির মনোবেদনা নূপুর নিক্কণে উবে যেতে বসেছে—

খাড়ি নিম কে নিচে
হুঁ তো হাইক লে যাত্র
ওয়াতারো মানরা ছানি
মানি দেখ লে...

নিমগাছের নিচে আমি দাঁড়িয়ে আছি
একা তোমার জন্য অপেক্ষায়
পথিকেরা আমাকে দেখে রঙ্গ করছে
বৃষ্টি ঝরছে
গাইছে ময়ূর আর পাপিয়া...

সেই ইয়াহিয়া এখন দেশের প্রেসিডেন্ট। আর সেই আকলিম এখন জেনারেল রানি। আগা জানি তাঁর রুম থেকে বেরোচ্ছেন না। তাঁকে বের করতে হবে। এটা এই মুহূর্তের সবচেয়ে গুরুতর রাষ্ট্রীয় সংকট। শুধু রাষ্ট্রীয় বললে কম বলা হবে। এটা এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় আন্তর্জাতিক সংকট। দুই ভ্রাতৃপ্রতিম দেশের মধ্যে সম্পর্ক কেমন যাবে ভবিষ্যতে, তা নির্ভর করছে প্রেসিডেন্টকে কত তাড়াতাড়ি তাঁর রুম থেকে বের করা যাবে, তার ওপর।

জেনারেল রানি ছুটছেন। জেনারেল ইসহাক তাঁর আগে আগে। জেনারেলের বুট মর্মর-পাথরে ঠকঠক আওয়াজ তুলছে। রানির রেশমি দোপাট্টা আর সালোয়ার-কামিজ শব্দ তুলছে খসখস। তাঁর হাইহিলও খটখট শব্দ তুলছে অশ্বখুরের মতোই। বাতাসে সেই হিসহিসানি, অনেক দিন আগের মারির পাহাড়ি পথে যা তার দোপাট্টা উড়িয়ে নিয়েছিল, খুলে দিয়েছিল নেকাব।

তাঁরা দরজা ঠেলে ঢুকলেন প্রথম হলঘরটিতে। ছাদ থেকে ঝুলছে ঝাড়বাতি। মেঝেতে ইরানি গালিচা। দেয়ালে তেলচিত্র। তাঁরা এরপর উঠতে লাগলেন ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে। প্রেসিডেন্ট দোতলার খাস কামরায়।

প্রতিটা মুহূর্ত মূল্যবান। আর্দালিরা সরে যাচ্ছে। নিরাপত্তারক্ষীরা উৎকণ্ঠিত মুখে ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে খুলে দিচ্ছে একের পর এক বিশাল কারুকার্যময় কবাট।

অবশেষে তাঁরা পৌঁছালেন খাস কামরার সামনে।

জেনারেল ইসহাক বললেন, 'রানিজি, এরপর যা করার আপনি করুন। আমি একটু দূরে থাকি।'

'আপনি কেন দূরে থাকতে চান?'

'আমার চাকরি ও ইজ্জত দুটো নিয়ে দূরে থাকাই কি উচিত কাজ হবে না?'

'আচ্ছা। যান, দূরে যান। আমি দেখছি।'

'আপনার সাফল্যের ওপর নির্ভর করছে পাকিস্তান ও পারস্য দেশের কূটনৈতিক সুসম্পর্ক। আমি আপনার সাফল্য কামনা করি।'

জেনারেল রানি দরজায় টোকা দিলেন।

সেই টোকার শব্দ বহু গুণে বেড়ে ছড়িয়ে পড়ল লম্বা করিডরে, সিঁড়িঘরে, প্রতিধ্বনিত হতে লাগল দেয়ালে দেয়ালে, ছাদে আর মেঝেতে।

কিন্তু প্রেসিডেন্ট দরজা খুলছেন না।

তিনি আরও জোরে টোকা দিলেন। ধাক্কা দিলেন।

চিৎকার করে উঠলেন, 'আগা জানি। আগা জানি...'

কোনো সাড়াশব্দ নাই।

তিনি এবার ঠিক করলেন দরজা খুলে ফেলবেন। তিনি দুহাত দিয়ে দরজার কবাটে জোরে চাপ দিতেই দরজা গেল খুলে। বাইরে আলো ছিল, মাথার ওপর ঝুলন্ত দুটো বাতি, ভেতরটা কি একটু অন্ধকার?

জেনারেল রানির চোখে প্রথমে খানিকটা অন্ধকারই আঘাত করল। তবু মানুষ পুরো নিকষ অন্ধকারেও দেখে। আর এখন তো দিনের বেলা, ঘরের এক কোণে জ্বলছে স্ট্যান্ডবাতি, মখমলের পর্দা ফুঁড়ে ঢুকে যাচ্ছে বাইরের আলো, জেনারেল রানি তো মুহূর্ত কয়েক পরই দেখতে পেলেন সবকিছু।

দেখতে পেলেন তাঁর আগা জানির সমস্তটা দেহ, পাশ থেকে, সেই কলপ-মাখানো চুল, এলোমেলো, উঁচু নাক, কোটরাগত বড় চোখের একটা পাশ, ইলেকট্রিক লাইটের হলদে আলোতেও লাল, তাঁর সেই ললাট, উন্নত, কিন্তু ভাঁজের দাগসমেত, সেখানে তাঁর সেই শজারুর কাঁটা-মার্কা ভুরু, ঝুলে পড়া ঠোঁট, তাঁর গ্রীবা, গ্রীবার নিচ থেকেই তাঁর সাদা-পাকা রোমরাশি, বুকভরা, পেটটা খানিকটা ঝুলন্ত, একটুখানি ভুঁড়ির লক্ষণসমেত, নাভির নিচটা, তারপর তলপেট, খানিকটা রোমশ, তার নিচে নুরজাহানের মুখমণ্ডল, হাত দুটোও, হাত দুটোর আড়ালে, আগা জানির হাত নুরজাহানের মাথার পেছনে একটা, আরেকটা বোধ হয় ঝুঁকে পড়ে তাঁর হৃদপিন্ড স্পর্শ করতে চাইছে, আগাজির ছায়া একবার সামনে একবার পেছনে ঝুঁকছে, তিনি 'আহ্ আহ্, আরও জোরে আরও জোরে' বলে

উঠছেন, নুরির পিঠে একটা স্বর্ণরেখা, রোমের নাকি আলোর, তিনি হাঁটু গেড়ে বসা, তাঁর পেট ঝুলে আছে, একটু কদাকারই লাগছে দেখতে, হাঁটু গেড়ে বসায় তাঁকে ডুলির মতো লাগছে, সৌন্দর্যের চেয়ে রানির কাছে সেটা বিবমিষা উদ্রেককারী বলে বেশি মনে হচ্ছে, কারণ কি ঈর্ষা! নাকি তাঁর কবিজনোচিত সৌন্দর্যবোধ ও রুচির উচ্চতা! নুরির মাথাটা দেয়ালঘড়ির পেন্ডুলামের মতো সামনে-পেছনে দুলছে।

ইয়াহিয়া বললেন, 'রানি, অসময়ে! এসো। জয়েন করো।'

রানি বললেন, 'আগা জানি, ইরানের শাহর বিদায়ের অনুষ্ঠান অলরেডি এক ঘণ্টা লেট হয়ে গেছে। আপনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ুন। নুরিজি, আপনি মাথাটা সরান। ওকে ছাড়ুন।'

ইয়াহিয়া বললেন, 'আরেকটু দিলেই কিন্তু হয়ে যাবে।'

রানি বললেন, 'আরেকটুর সময় নাই, আগাজি। আপনি অলরেডি লেট।'

নুরি ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছেন। তাঁর অন্তর্বাস খুঁজছেন। সালোয়ারের স্তূপ থেকে সেটা এই সময়ে খুঁজে না পাওয়াই স্বাভাবিক।

ইয়াহিয়া বললেন, 'আমার গাউনটা কই?'

রানি বললেন, 'আগা জানি, এখন আর গাউন পরতে হবে না। একবারে বাইরে যাওয়ার কাপড় পরে নিন। কোনটা পরার কথা। আমি পরিয়ে দিচ্ছি।'

ওই ওয়ার্ডরোবে কাপড় রেডি করা আছে। টাই পর্যন্ত।

রানি নিয়ে এলেন। আন্ডারওয়্যার। আগাজির সামনে বসে বললেন, 'পা ঢোকান।'

ইয়াহিয়া বললেন, 'একবার তুমি একটু আদর করে দেবে না? দাও না একটু!'

রানি কঠোর গলায় বললেন, 'পা ঢোকান।'

ইয়াহিয়া বললেন, 'একটু অন্তত চুমু দিয়ে দাও।'

রানি বললেন, 'মাতলামো করবেন না, অনুগ্রহ করুন। দুই দেশের সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে।'

ইয়াহিয়া আন্ডারওয়্যারে পা ঢোকালেন। বললেন, 'দুই দেশের সম্পর্কের চেয়ে তোমার আমার সম্পর্ক বেশি মূল্যবান।'

নুরজাহান ফোঁস করে উঠলেন, 'কী বললেন!'

সে কথায় পাত্তা না দিয়ে রানি বললেন, 'এবার মাথাটা ধরুন। প্যান্টে পা ঢোকান।'

ইয়াহিয়ার পা কাঁপছে। তিনি পুরো ওজন রানির মাথার ওপর চাপিয়ে দিলে রানি বললেন, 'উফ, পড়েই যাব তো। ওই চেয়ারটা ধরুন এক হাতে। হ্যাঁ, এবার পা ঢোকান।'

'কোথায় পা ঢোকাব, ডার্লিং।'

'এই নরকে। এখানে ঢোকান।'

রানি তাঁর প্যান্টের জিপার লাগালেন।

তিনি তাঁর শার্ট তাঁকে পরিয়ে দিলেন। শার্ট প্যান্টের ভেতর ঢুকিয়ে তার বোতাম লাগালেন। তাঁর বেল্ট ঢোকালেন। ততক্ষণে নুরজাহান তাঁর কাপড়চোপড় পরে নিয়েছেন।

রানি ইয়াহিয়াকে কোট পরালেন। তাঁর টাইয়ের নট বেঁধে দিলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল তাঁর ফেলে আসা স্বামীর কথা। একদিন তিনি এইভাবে তাঁর স্বামীর টাইয়ের নটও বেঁধে দিতেন। তাঁরও দুই বাহু পাখির ডানার মতো উড়িয়ে দিয়ে তাঁকে পরিয়ে দিতেন কোট।

আগাজি তাঁকে চুম্বন করলেন কপালে।

এতক্ষণে ঘরে আর্দালি খানসামা প্রবেশ করতে পেরেছে। তারা তাঁকে জুতা পরাল।

রানি বললেন, 'আপনি একটু বাথরুমে যান। না হলে আবার তেহরানে যা করেছিলেন, তা করতে পারেন।'

'তেহরানে কী করেছিলাম?'

'গাড়ির পার্কিং লটে দাঁড়িয়ে সবার সামনে পেশাব করেছিলেন। আর তা করেছিলেন রাষ্ট্রীয় সফরের সময়।'

'আরে আমি তো তখন মদে চুর হয়ে ছিলাম। পেট মদে ছিল ঠাসা। কিডনি ফেটে যাচ্ছিল। আমার নিজের ওপরে নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আমার হুঁশও ছিল না। বেহুঁশ লোক কী করে, তা নিয়ে পরে কথা বলা উচিত নয়।'

'আপনি এখনো বেহুঁশ। চলুন, আপনাকে আমি বাথরুম করিয়ে আনি।'

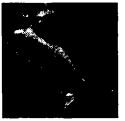

ইয়াহিয়া টলমল পায়ে এগোতে থাকেন। ঢেকুর ওঠে, তাতে মদের গন্ধ, বিশাল অভ্যর্থনাকক্ষের বাতাস তাতে মাতাল হয়ে যায়। দেয়ালে কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর ছবির মুখটা একটুখানি বাঁকা হয়, জিবটা যেন ঠোঁট চাটে, তাঁরও খুব প্রিয় ছিল এই হুইস্কি। লিয়াকত আলী খানের ছবিটা বাঁক খায়, আইয়ুব খানের তেলচিত্রের ওপর আলো পড়লে তা আয়না হয়ে ওঠে। ইয়াহিয়া বললেন, 'ইসহাক, এই শালার বিল্ডিংটা ভালো করে বানায়নি নাকি, এর দেয়াল তো নড়ে, মেঝে তো উঁচা-নিচা।'

ইসহাক বললেন, 'স্যার, আপনি কি একটু টক খেয়ে নেবেন!'

'টক কেন খাব?'

'টক খেলে বিল্ডিং শক্ত হবে, স্যার।'

'রাইট। টক খেলে বিল্ডিং শক্ত হয়।'

তিনি একটা লাল চেয়ারে বসে পড়েন।

আর্দালিরা দৌড়াতে থাকে টকের গেলাস আনতে। মেঝেতে কার্পেটটাও লাল।

'আমার পাখিরা কেমন আছে?'

ইসহাক প্রথমে বুঝতে পারেন না ইয়াহিয়া খানের প্রশ্নটা। স্যার, কোন পাখির কথা বলছেন। নারীদের কথা? নারী হলে কোন নারী? অন্তত এক শ জন নারীর সঙ্গে এই হাউসে রাষ্ট্রপতি একলা ঘরে অন্তত এক ঘণ্টা করে সময় দরজা বন্ধ করে কাটিয়েছেন, এর মধ্যে কোন পাখির কথা বলছেন প্রেসিডেন্ট!

'স্যার। কোন পাখি?'

'আমার রাজহাঁসগুলো কেমন আছে? আমার তোতা পাখিগুলো?'

ইসহাক বলেন, 'ও, ওরা খুব ভালো আছে, স্যার।'

'খুব ভালো আছে? ওরা আমাকে মিস করছে না?'

'করছে, স্যার।'

'হুঁ। আমার নুরি আমার রানি, এরা কিন্তু পাখিগুলোকে ঈর্ষা করে। তারা বলে, যাও, তুমি পাখির কাছে যাও। তোমার তোতার কাছে যাও। তোমার হাঁসের কাছে যাও। আচ্ছা, ইসহাক বলো তো...'

'স্যার।'

'নারীরা যদি পাখিদের ঈর্ষা করে, তাহলে পাখিরা কি নারীদের ঈর্ষা করতে পারে না?'

'স্যার, আপনার টক এসে গেছে, স্যার।'

'আচ্ছা দাও। শোনো। পেছনে দুজনকে রেখে এলাম। নুরি আর রানি। ওরা আবার দেখো মারামারি করে আমার ঘর রক্তে ভাসিয়ে না দেয়। কী করব বলো। ওরা আমাকে খুব ভালোবাসে। আর নারীর হৃদয় ঈর্ষা দিয়ে ঠাসা!'

ইয়াহিয়া গেলাসে চুমুক দেন। টক জিনিসটা তাঁর পছন্দ নয়। কিন্তু ইসহাক যেভাবে তাঁর মুখের সামনে গেলাসটা ধরেছেন, না খেয়ে উপায় আছে?

গেলাস থেকে খানিকটা তরল ছিটকে পড়ে তাঁর ক্রিম রঙের কোটে। ইসহাক পকেট থেকে রুমাল বের করে সেটা মুছে দেন।

'মেয়েদের এই হলো অসুবিধা, বুঝলে ইসহাক, একজন আরেকজনকে সহ্য করতে পারে না। কিন্তু ছেলেরা পারে।'

ইসহাক বললেন, 'স্যার, আমাদের দেরি হয়ে যাচ্ছে, স্যার।'

ইয়াহিয়া বললেন, 'দেরি না হয় একটু হলোই। শাহ আমাদের মেহমান। আমরা তো চাইবই তাঁকে বেশিক্ষণ ধরে রাখতে। আমি বলছিলাম কি, আমি কি রানিকে রফিকের রুমে ঢুকিয়ে দিইনি? তোমরা কি সেই রুমের দরজা বাইরে থেকে তালা মেরে বন্ধ করে রাখোনি?'

'স্যার। উঠুন। আমাদের এখন যেতেই হবে।'

সায়গল গ্রুপের মালিক রফিক সায়গল।

প্রথম দেখাতেই আকলিমের মনে হয়েছিল, এ তো সাক্ষাৎ দেবদূত। শূকচঞ্চু নাসা, মানে টিয়া পাখির মতো নাক। চোখ দুটো জ্বলছে, বুদ্ধি আর দুষ্টুমির ঝলকে। দীর্ঘ দেহ। তরবারির মতো ঋজু। পাঞ্জাবের গমদানার মতো গায়ের রং। কামানো গাল সবুজাভ।

আকলিমের হেরেমখানার সোফায় রফিক সায়গল বসে আছেন। বৈদ্যুতিক বাতির হলুদ আলো পড়েছে তাঁর মুখে। মুখখানিকে মনে হচ্ছে গ্রিক ভাস্কর্য।

তার পাশে বসে আছেন মেজর জেনারেল খুদাদাদ। লাহোরের সামরিক আইন প্রশাসক। খুদাদাদ তাঁকে এনেছেন আকলিমের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য।

খুদাদাদ বললেন, 'রফিক আপনার একজন ভক্ত। আপনাকে তিনি কিছু উপহার দিতে চান। আপনি বলুন, আপনাকে কী দিলে আপনি খুশি হবেন?'

আকলিম সত্য কথাটাই বললেন, 'আমি তাঁর সেবাদাসী হতে পারলে খুশি হব।'

খুদাদাদ বললেন, 'সে তো আপনার উপহার হলো রফিকের জন্য। কিন্তু রফিক তো আপনাকে সত্যি কিছু উপহার দিতে চায়।'

খুদাদাদের মুখ থেকে একটা বদ গন্ধ আসছে। আকলিম তাঁর ওড়না টেনে নাকের ওপরে তোলেন।

রফিক বললেন, 'একটা গাড়ি আর দশ লাখ রুপি আপনাকে উপহার দিতে চাই নজরানা হিসেবে। আপনি প্রেসিডেন্টকে বলবেন, আমার একটা ফেভার লাগবে। একটা সাপ্লাইয়ের কাজ আটকে আছে। তিনি একটু প্রসন্ন হলেই আমি দেশের এই সেবাটা করতে পারি। আপনি একটু বলে দেবেন।'

আকলিম বললেন, 'সে হবে খন। কাজটা কী, আপনি একটিবার একলা এসে আমাকে বুঝিয়ে দেবেন। আমি খোদ আপনার কাছ থেকেই বিষয়টা

বুঝে নিতে চাই। একটু নিরিবিলি পরিবেশে। যখন কেউ থাকবে না। শুধু আপনি আর আমি...'

আকলিমের শ্বাস ঘন হয়ে আসে, কণ্ঠ ভারী। তাঁর শরীর ভিজে যাচ্ছে। আশ্চর্য, এই জীবনে কম পুরুষ তো ঘাঁটলেন না, কম পুরুষ ছানলেন না। কিন্তু এই লোকটার ভেতরে কী আছে? তাঁর চেহারা দেখেই তিনি আর্ত ও আর্দ্র হয়ে পড়ছেন!

রফিক বড়লোক। বড়লোকেরাই তাঁর কাছে আসে! রফিক হ্যান্ডসাম। হ্যান্ডসাম মানুষও তো তিনি কম চেখে দেখেননি। ভুট্টোও কম হ্যান্ডসাম নন। ভুট্টোর সঙ্গেও তাঁর মধুর ও গভীর সম্পর্ক। কিন্তু ভুট্টোকে দেখে তিনি প্রথম দিনেই প্রেমে পড়েননি। তাহলে এর বেলায় এরকম হচ্ছে কেন!

রফিক ওঠেন। বলেন, 'আজকে আমার একটু তাড়া আছে। আমি আপনাকে নজরানা পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করব। খুদাদাদ সাহেবই আপনার কাছে আনবেন আমার সামান্য উপহার।'

'আপনি আসছেন তো? সময় করে?'

'সময় করে', রফিককে নার্ভাস দেখায়।

কিন্তু রফিককে ধরা যায় না। কয়েক দিনের মধ্যেই খুদাদাদ আসেন। ফালেত্তি'স হোটেলে। একটা গাড়ির চাবি আর কাগজ দিতে।

ফালেত্তি'স হোটেলের ডাবল রুম। এক পাশে সোফা। সাজসজ্জা সবই পারস্য কায়দার। মাথা থেকে ঝুলছে লণ্ঠন আকারের বাতি। এর লম্বা করিডরে সাদা-কালো পাথর, কোনাকুনি দাবার ছকের মতো। অলিন্দ, খিলান সবই বাদশাহি স্থাপত্যরীতির।

খুদাদাদ গাড়ির চাবিটা আকলিমের সামনে দোলাতে থাকেন। বলেন, 'এটা তোমার হাতে দেব না। সামান্য চাবি। একটা গাড়ির চাবি। এটা টেবিলের ওপরে থাকুক।'

'তোমার হাতে মানাবে এই চাবি। তুমি এটার দখল নাও।' তিনি তাঁর দু'পায়ের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেন।

গাড়ির চাবি ড্রাইভারের হাতে, আর তাঁর শরীরের চাবিটি তিনি আকলিমের হাতে তুলে দেন।

রফিক আর আসেন না। ফোনে কথা হয় পরে। তিনি বলেন, 'হ্যালো,

জেনারেল রানিজি, গাড়ি পছন্দ হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'রং?'

'খুব সুন্দর। সিলভার আমার প্রিয় রং।'

'টাকা ঠিক ছিল। গুনে নিয়েছেন তো?'

'টাকা?'

'হ্যাঁ। দশ লাখ ছিল। গুনে নিয়েছেন? টাকাপয়সার ব্যাপারে কাউকেই বিশ্বাস করতে হয় না। খুদাদাদকে আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু টাকার ব্যাপারে কাউকে বিশ্বাস না করাই পৃথিবীর নিয়ম।'

'খুদাদাদ আমাকে এক টাকাও দেয়নি।'

'কী বলেন? ওর টাকা লাগবে সেটা সে আমাকে বললেই পারত। আপনার টাকা কেন মেরে দেবে?'

'যে টাকার কোনো রসিদ নাই, সেটা যখন যার কাছে থাকে, সেটা তারই। আপনি আমার কাছে এলে আর এই সমস্যা হতো না। তবে ওই টাকা আমি তাকে হজম করতে দেব না। আমার নাম জেনারেল রানি।'

'আমি আপনাকে ক্ষতিপূরণ করিয়ে দেব। আমার কাজটির কথা যেন ভুলবেন না।'

'আপনার কাজ আমি করে দিয়েছি। আপনি অবশ্যই কন্ট্রাক্টটি পাচ্ছেন। কিন্তু আমার ক্ষতিপূরণ হবে, একটিবার আপনি যদি আমার মেহমান হয়ে আসতেন।'

'আচ্ছা।'

'আচ্ছা না। বলুন কবে আসবেন?'

'নিশ্চয়ই আসা হবে। আজকাল ব্যবসা নিয়ে খুবই ব্যস্ত।'

'পুরুষমানুষ ব্যস্ত তো থাকবেই। ব্যস্ততা তাদের ক্লান্ত করে। আর সেই ক্লান্তি মুছে দেবার জন্যই তো আকলিমদের যত আয়োজন।'

'আগাজির শরীরটা এখন কেমন?'

'আগা জানির শরীর তো সব সময়ই ভালো থাকে।'

'আচ্ছা, ওর ওই ঘন কালো চুল, সামনেরটা একটুখানি সাদা, এটার রহস্য কী, বলুন তো। তিনি কি চুলে রং এবং জেল দুই ব্যবহার করেন?'

'রফিক সাব, আপনি আমার কথা এড়িয়ে যাচ্ছেন। আপনি কথা

ঘোরাচ্ছেন। আপনি যেখানে চাইবেন, সেখানে গিয়ে আমি আপনার সাথে দেখা করব। আমি আপনার টাকা চাই না। ব্যবসা চাই না। আমি আপনার সংসারেও ঢুকতে চাই না। আমি গোলাপের গায়ে লেগে থাকা শিশিরবিন্দুর মতো আপনার সঙ্গে একটা রাত্রি কাটাতে চাই। সকালের রোদ আপনা-আপনিই আমাকে মিইয়ে দেবে।'

'রানিজি, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি। আসলে আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। যেমন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে আমি শ্রদ্ধা করি। আপনি তাঁর রানি। আমি একজন ভৃত্য মাত্র। আমার উচিত হবে না প্রেসিডেন্টের পিয়ারিকে অন্য কিছু ভাবা। আপনি আমার ভাবির মতো।'

'সত্যিকারের ভাবির সঙ্গেও দেবরের সম্পর্ক হয়। আর আপনি তো এক কাল্পনিক ভাইয়ের কাল্পনিক প্রেমিকার কথা বলছেন। শোনেন। আমি হলাম ঝিলম নদীর মতো। আমার পানি কখনোই অপবিত্র হয় না। আপনি আসবেন।'

'আমি সাঁতার জানি না, রানিজি।'

'তপ্ত মরুভূমিতে একটা তৃণের মতো আমি তৃষ্ণার্ত। আপনি হলেন সেই পানির আধার, যা আমার পিপাসা মেটাতে পারে। আমি পানি চাই। আপনি আমাকে সিঞ্চন করুন। আমি আপনার আলিঙ্গনের মধ্যে যেতে চাই। আপনার দুবাহুর চাপে পিষ্ট হতে চাই।'

'রানিজি। আপনার তবিয়ত বোধ হয় আজকে একটু খারাপ। আপনি বোধ হয় বেশি পান করে ফেলেছেন। আমি পরে আবার কথা বলব।'

'শুধু কথায় আমার হবে না, রফিক সাহেব। আমি একটা রক্ত-মাংসের নারী। আমার কামনা আছে। আমারও হৃদয় আছে। আমি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছি। আমার রক্ত চঞ্চল হয়েছে। কেবল আপনি আমাকে শীতল করতে পারেন। আপনি আসুন। এখনই আসুন। নয়তো বলুন আমাকে কোথায় যেতে হবে। আপনি যেখানে যেতে বলবেন, আমি সেখানেই যাব। আপনি আমাকে যা করতে বলবেন, আমি তা-ই করব।'

'রানিজি, আজ আমি রাখি। খোদা হাফেজ।'

আশ্চর্য এই মানুষটি তো।

আকলিম ফোনের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। এই দেবদূতকে তাঁর চাই-ই চাই।

আর খুদাদাদ! তুমি আমার দশ লাখ টাকা মেরে দিয়েছ। টাকা আমার জন্য বড় নয়। দশ লাখ টাকা আমার জীবনে অনেক আসবে। অনেক যাবে। কিন্তু এটা রফিক সায়গলের টাকা। তাঁর হাতের স্পর্শ লেগে আছে এই টাকায়। তাঁর ঘাম লেগে আছে ওই টাকায়। ওই টাকা তুমি মেরে দিয়েছ। আমি তোমাকে ছাড়ব না, খুদাদাদ। আমি তোমাকে দেখে নেব। তুমি জানো না আমার কত ক্ষমতা! তুমি কি ভেবেছ কেবল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান আমার দোস্ত! আর কেউ নেই আমার! পুরো পাকিস্তানের যত ক্ষমতাধর মিলিটারি, সিভিল কর্তা, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, সবাই আমার গোলাম, না হয় প্রেমিক, না হয় বন্ধু। আমার কাছে কে আসে না? ওই যে তোমাদের প্রিয় পলিটিশিয়ান ভুট্টো, সে-ও এসে আমার সোফায় কত দিন লম্বা হয়ে শুয়ে থেকেছে।

আমার হাত কত লম্বা, তুমি জানো না।

আমার জিব কত কাজের, তোমার ধারণাই নাই। তুমি ভেবেছ জিব কেবল কথা বলার জন্য? লেহন করার জন্য? খুদাদাদ, তা ভেবে থাকলে তুমি ভুল করেছ। এই জিব দিয়ে আমি কার্যোদ্ধারও করি। তোমার মতো একজন মেজর জেনারেলকে আমার জিব দিয়ে দলা পাকিয়ে থুতু বানিয়ে আমি নর্দমায় ছিটাতে পারি। এবং আমি তা-ই করব, খুদাদাদ।

রফিককে চেখে দেখার সাধ আকলিম তথা জেনারেল রানির অপূর্ণ থাকেনি।

পেশোয়ারের গভর্নর হাউস। ব্রিটিশদের বানানো সেই প্রাসাদ পশ্চিম আর প্রাচ্য স্থাপত্যরীতির অপরূপ সমন্বয়ের নিদর্শন। যেমন আছে বড় বড় স্তম্ভ, তেমনি আছে খিলান। তার চারপাশে বাগান। সেই উদ্যানে সারিবদ্ধ তরুশ্রেণি, জ্যামিতিক আকার নিয়ে আছে ঝাউগাছগুলো, পরিকল্পিতভাবে ছাঁটাই হয়ে। আছে চার হাজার বছরের পুরোনো পাথরের পেয়ালা। আছে ঝরনাধারা। আছে চিড়িয়াখানা। তাতে কত রংদার পাখপাখালি। লম্বা করিডর। বিশালাকার কাঠের কারুকার্যখচিত দরজা। বৈঠকখানা, দরবার হল। সেই দরবার হলে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সেনাবাহিনীর প্রধান প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান আয়োজন করেছেন এক পার্টির। পার্টিতে দাওয়াত পেয়েছেন দেশের সবচেয়ে অভিজাত ও ক্ষমতাবান মানুষেরা। সবচেয়ে বড়লোকদের একজন হিসেবে আছেন রফিক সায়গল।

আর প্রেসিডেন্টের বিশেষ অতিথি হিসেবে এসেছেন আকলিম। ওরফে রানি জেনারেল। আদরের একটা পর্যায়ে আগা জানি তাঁকে ডাকেন মোটি বলে। রানি যে একটু মোটা, ইয়াহিয়া তা পছন্দই করেন।

উর্দিপরা বেয়ারারা মাথায় মুকুট পরে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন করছে। গীত হচ্ছে, নৃত্যও পরিবেশিত হচ্ছে। আকলিমের চোখ পড়ে গেল রফিকের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত সত্তায় জ্বলে উঠল আগুন। কামনার। অচরিতার্থ বাসনার।

তাঁর অসাধ্য কী আছে এই পাকিস্তানে। তাঁর অগম্য কী আছে এই পাকিস্তানে? তাঁর অপ্রাপ্য কী আছে এই দেশে?

এই দেশের সকল দণ্ড ও মুণ্ডের কর্তা হলেন সিএনসি, প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান।

দণ্ড ও মুণ্ডের কর্তা তিনি।

আর তাঁর দণ্ড ও মুণ্ডের কর্ত্রী হলেন আকলিম।

আকলিম মদের গেলাস নিয়ে এগিয়ে গেলেন তাঁর আগা জানির দিকে।

গেলাস এগিয়ে দিলেন তাঁকে।

হানলেন দৃষ্টিবাণ।

ঢলে পড়লেন তাঁর কোলে। তাঁর কান দিলেন কামড়ে। তারপর পৃথিবীর সমস্ত মাদকতা তাঁর কণ্ঠস্বরে ঢেলে দিয়ে বললেন, 'আগা জানি, আমার কোনো ইচ্ছাই তো আপনি অপূর্ণ রাখেন না? তাই তো?'

'নিশ্চয়ই। তুমি যা চাইবে, এই সোনার পাকিস্তানে তা-ই ঘটবে। আমি তা-ই ঘটাব?'

'আপনি আমার মাথা ছুঁয়ে বলুন।'

'এই যে মাথা ছুঁলাম।'

'আপনি আমার হাত ধরে বলুন।'

'এই যে হাত ধরলাম।'

'আপনি আপনার বুকে হাত দিয়ে বলুন।'

'এই যে আমি বুকে হাত দিলাম।'

'আমার বুকে না, আগাজি। আপনি আপনার বুকে হাত দিয়ে বলুন।'

'এই যে আমার বুকে হাত দিয়ে বলছি...'

'বলুন, আমি যা চাই, আপনি তা দেবেন।'

'তুমি যা চাইবে তা-ই পাবে, মোটি...'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'সত্যি?'

'সত্যি।'

'কসম?'

'কসম।'

'রফিক আমার সঙ্গে প্রেম করতে চায় না। আপনি ওকে আমার সঙ্গে প্রেম করিয়ে দিন।'

'কী বললে?'

'রফিক সায়গল আমার সঙ্গে প্রেম করতে চায় না। আমি চাই ও আমার সঙ্গে প্রেম করুক।'

'অবশ্যই ও তোমার সঙ্গে প্রেম করবে। তুমি যা চাও তা-ই হবে।'

'তাহলে এখনই ব্যবস্থা করুন।'

ইয়াহিয়া বলেন, 'এই হাউসের কেয়ারটেকার কে?'

কেয়ারটেকার একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর। তিনি দৌড়ে আসেন, 'স্যার।' তিনি তাঁর বুট জোরে বাড়ি মারেন মেঝেতে। মেঝেতে কার্পেট থাকায় শব্দটা হয় জলদগম্ভীর।

ইয়াহিয়া বলেন, 'মাই বয়, রানি এলিজাবেথ এসেছিলেন পেশোয়ারে। এই গভর্নর হাউসে ছিলেন। রাইট?'

'রাইট, স্যার।'

'কোন রুমে ছিলেন?'

'ওই ডান দিকে দোতলায়, স্যার।'

'আমাকে এখুনি নিয়ে চলো সেখানে।'

'ইয়েস, স্যার।'

'মোটি, তুমিও আমার সঙ্গে এসো।'

মেজর অব. রুমের তালা খোলার ব্যবস্থা করেন।

'শোনো, আমি এই রুমের বাথরুমে মুতব।'

'মোটি, তুমি এখানে এই বিছানায় বসো। আমি মুতে আসি। রানির

কমোডে আমি মুতে আসি। হি হি হি।'

প্রেসিডেন্ট দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিশানা ঠিক করার চেষ্টা করেন। মদ খেলে নিশানা এলোমেলো হয়ে যায়। ফিরে এসে তিনি বলেন, 'কে আছ, যাও, রফিক সায়গলকে ডেকে আনো।'

তিনজন জেনারেল ছুটতে থাকেন রফিক সায়গলকে ডাকতে।

রফিক সায়গল রানির রুমে প্রবেশ করেন।

বিশাল কক্ষ। পুরো মেঝে লাল গালিচায় মোড়া। সেগুন কাঠের কলোনিয়াল কায়দার পালঙ্ক। ড্রেসিং টেবিল। সোফা। ছাদ থেকে ঝুলছে ঝাড়বাতি।

ইয়াহিয়া বলেন, 'আমি প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। আমি যা বলব, তা-ই সামরিক বিধি। সামরিক আইনের বিধিবলে আজ রাতটা রফিক সায়গল কাটাবে আকলিম আখতারের সঙ্গে। এইটা আমার আদেশ।'

তিনি আকলিমের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপলেন।

'চলো সবাই বাইরে। রফিক থাকো। মোটি, তুমি থাকো। এবার খোদা তোমার মনের বাসনা পূর্ণ করবেন। ওকে সারা রাত আদর করবে। একদম ঘুমুতে দেবে না। যাও, মোটি। ওকে আজ যদি নিংড়ে নিতে না পেরেছ, তাহলে তুমি কোনো মেয়েমানুষই নও।'

তাঁরা বাইরে আসেন। রফিক আর আকলিম ভেতরে।

ইয়াহিয়া আদেশ দেন, 'বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে দাও।'

বিশাল দরজা ঘর্ঘর শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে যায়।

ভেতরে রফিককে পেয়ে তাঁর ওপর বাঘিনীর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েন আকলিম।

রফিক বললেন, 'জেনারেল রানি, আপনি কী করছেন?'

'আমি ভালোবাসা আদায় করছি।'

রফিক বললেন, 'গায়ের জোরে সবকিছু আদায় করা যায়, গয়নাগাটি, পয়সাকড়ি, কিন্তু ভালোবাসা? কক্ষনো না?'

'তুমি আমাকে ভালোবাসা দিতে বাধ্য, এটা মার্শাল ল অর্ডার।'

'এভাবে তুমি আমার দেহ পেতে পারো, কিন্তু মন পাবে না।'

'আমি তোমার সবটা চাই। তোমার দেহ চাই। তোমার মন চাই। আমি তোমার এটা চাই, আমি তোমার ওটাও চাই।'

'এইভাবে কোনোটাই কি পাওয়া যায়?'

'কীভাবে পাওয়া যায়, বলো। আমার তিন জীবনের প্রেম। তোমাকে বলতেই হবে।'

'সবুর করো। বসো। এসো। শান্ত হও।'

'না। আমি শান্ত হব না। তুমি আমাকে অশান্ত করেছ। এখন আমি সমুদ্রঝড়ের মতো অশান্ত। একমাত্র তুমি আমাকে শান্ত করতে পারো। নাও। ধরো। আদর করো।'

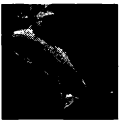

কয়েক মাস আগের কথা। তখনো ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট হননি। আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট।

আকলিম জড়িয়ে ধরে আছেন ইয়াহিয়া খানকে।

ইয়াহিয়া খানের বুকের রোম পেকে যাচ্ছে। 'আগা জানি, আপনার বুকের রোম সাদা হয়ে যাচ্ছে।'

'বুকের রোম সাদা হলে কোনো অসুবিধা নাই।'

'না, বুকের রোম সাদা হলে বিশ্রী লাগে। দিন, আমি তুলে দিই।' আল্লাদে গলে পড়তে পড়তে ঢলে পড়তে পড়তে বললেন আকলিম।

আকলিমের হেরেমখানায় এসেছেন সেনাবাহিনীর প্রধান। ১৯৬৯ সালের বসন্তে, যখন বাগানে অনেক ফুল, ফুলের অনেক রেণু উড়ছে রাওয়ালপিন্ডির আকাশে-বাতাসে। আকলিমের হেরেমখানার একটা মেয়ের ফুলের রেণুতে অ্যালার্জি, সে সারাক্ষণ হাঁচি দিচ্ছে।

আকলিম তাঁর ডান হাতের তর্জনী ও আর বৃদ্ধাঙ্গুলির বড় বড় নখ একখানে করে চিমটি দিয়ে ইয়াহিয়ার বুকের রোম তুলছেন।

'মোটি, কী করছ তুমি, সোনা!'

'তোমার বুকের সাদা রোম তুলে দিচ্ছি।'

'শোনো, সাদা রোম তুলছ তোলো। কিন্তু একটা কাঁচা রোম যদি তোলো তাহলে কিন্তু তোমার জরিমানা হবে?'

'কী জরিমানা?'

'একটা কাঁচা রোম তুললে তুমি আমাকে একবার আদর করে দেবে?'

'যেন সেটা আপনি পাচ্ছেন না?'

হঠাৎই টেলিফোন বেজে উঠল।

'উফ। এখন আবার কে ফোন করল?' আকলিম বিরক্তিভরা কণ্ঠে বললেন।

ইয়াহিয়া বললেন, 'একটা জরুরি কল আসতে পারে। ধরো।'

'হ্যালো,' হাত বাড়িয়ে আকলিম ফোনটা ধরলেন, ইয়াহিয়া তাঁর খোলা বুকের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ছয় সন্তানের জননী এই নারী, কে বলবে?

'হ্যালো!' আকলিম বললেন।

'চিফ স্যারকে একটু দেবেন? খুব জরুরি।'

'আগাজানি, কথা বলবেন?'

'দাও।'

'হ্যালো।' ইয়াহিয়া বললেন।

'স্যার, আমরা আপনার কথামতো শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলেছি, স্যার।'

'কী বলে শেখ মুজিব?'

'তিনি বলেন, তিনি ছয় দফা দিয়ে রেখেছেন তিন বছর আগেই। সেটা মেনে নিতে প্রস্তুত থাকলে আপনি এগিয়ে যেতে পারেন। তবে একটাই শর্ত। ইলেকশন দিতে হবে।'

'মশাদের নেতা কী বলে? ছয় দফা আবার কী জিনিস। তাকে বলো, আমার একমাত্র লক্ষ্য হলো ইলেকশন দেওয়া। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে যত তাড়াতাড়ি পারি ক্ষমতা দিয়ে আমি ব্যারাকে ফিরে যাব। নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনতন্ত্র বানাবে।'

'আমরা এ কথা তাঁকে বলেছি, স্যার। কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষে তাঁকে বাথরুমে ধরেছি। তিনি সব শুনে বললেন, সিএনসিকে বলবেন, তাঁর কথা আমি কিছু শুনিনি।'

'মুজিব একটা আস্ত গোঁয়ার। তার মনোভাব কী বুঝলে। আমি

প্রেসিডেন্ট হলে সেটা সে মানবে কি না।'

'মনে হলো, ইলেকশন দেবেন এই প্রতিশ্রুতি প্রথম থেকেই দেওয়া হলে তাঁরা মানবেন।'

'মুজিবকে বলো আমার এখানে এসে আমার সাথে যেন দেখা করে যায়।'

'রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স করে তিনি ফিরে যেতে চান। আপনার সাথে দেখা হবে বলে মনে হয় না।'

আকলিম বলেন, 'কার ব্যাপারে কথা হচ্ছে?'

'শেখ মুজিবুর রহমান। পূর্ব পাকিস্তানের নেতা', ইয়াহিয়া বললেন।

'আপনি কী করছেন? সে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের এক নম্বর শত্রু। তার সঙ্গে কথা বললে আপনার ক্ষতি হতে পারে।'

'ক্ষতি করার ক্ষমতা আর আইয়ুব খানের থাকছে না, মোটি। আমিই প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছি।'

'আপনি প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। তুমি আমাকে বলেছিলে না, সব সময় আমাদের ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। লুকিয়ে-ছাপিয়ে চলতে হয়! আমি প্রেসিডেন্ট হলে তোমার সুবিধা হয়!'

'তাহলে তো খুব মজা হবে। আমি আর আপনি সারাক্ষণ মজা করব। কেউ আমাদের বাধা দেবার থাকবে না।'

'তা থাকবে না।'

'কিন্তু আপনি তখন বেশি ব্যস্ত হয়ে পড়বেন। আপনি আর আমাকে সময়ই দেবেন না।'

'তোমাকে আমি সময় দেব না, তাও কি হয়, মোটি। তোমার মনে আছে, আমি সেই ১৯৬৫-এর যুদ্ধের সময়ও তোমাকে একনজর দেখার জন্য হেলিকপ্টারে চড়ে গুজরাটে গিয়েছিলাম।'

'নিশ্চয়ই মনে আছে।'

আকলিমের মনে পড়ে যায় সেদিনের কথাও, যেদিন ডিএসপি মাখদুম আর ইয়াহিয়ার মধ্যে মারামারি লেগে গিয়েছিল। মাখদুমও আকলিমকে খুব

ভালোবাসত। কিন্তু তার ভালোবাসা ছিল ভীষণ দখলদার। হেলিকপ্টারে ইয়াহিয়া এসেছেন তাঁকে দেখার জন্য। আর মাখদুম কী করল, ইয়াহিয়াকে দেখেই মাতলামো শুরু করল। সবকিছু সে ভেঙে ফেলতে চায়। কী সব খিস্তিখেউড়ই না সে করছিল।

এর মধ্যে আরেক মাতাল এগিয়ে এল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। মাখদুমের বডিগার্ড।

মাখদুম বলছিল, 'আকলিম, তোমার ওই বুক দুটো শুধুই আমার। আর কেউ ওটা নিতে পারবে না।'

মাখদুমের বডিগার্ডও তখন ছিল মাতাল। সে তার রিভলবার বের করে তাক করল আকলিমের বুকের দিকে। সে টার্গেট ঠিক করছে, তার হাত কাঁপছে।

গুলি বেরিয়ে গেল, গিয়ে লাগল একটা হুইস্কির বোতলে। পুরো ঘর ভরে গেল স্কচের গন্ধে।

গুলির শব্দ শুনে ইয়াহিয়া উল্টো দিকে দৌড় ধরেছিলেন। একটু পরই শোনা গেল হেলিকপ্টারের শব্দ। ইয়াহিয়া ওই আকাশে...

'মোটি, তোমাকে খুশি করার জন্যই তো আমি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হতে যাচ্ছি। তুমি কি চাও না আমি প্রেসিডেন্ট হই?'

'অবশ্যই চাই, আগা জানি', আকলিম বুকের রোম তুলতে তুলতে ইয়াহিয়ার পেটের দিকে যান। বলেন, 'আপনিই তো একমাত্র এই দেশের প্রেসিডেন্ট হওয়ার যোগ্য। আপনার মতো আর কে আছে? আপনার কত সুনাম। আপনি নাদির শাহর বংশের লোক। ইরান থেকে এসে যারা দিল্লি দখল করেছিল।'

'তা বটে।'

'আপনার মতো ব্রিটিশ কায়দা জানা জেনারেল আর কে আছেন? আপনি স্যান্ডহার্স্ট থেকে ট্রেনিং নেওয়া না?'

'আমার আদব-কায়দা সবই স্যান্ডহার্স্ট। যদিও ট্রেনিংটা আমি দেরাদুন থেকেই নিয়েছিলাম, মোটি সোনা।'

'তা হোক। আপনি তো ব্রিটিশ আর্মি ছিলেন। ইতালিতে যুদ্ধ করেছেন! আমেরিকায় করেছেন!'

'আমেরিকায় না, মোটি। আমি গিয়েছিলাম আফ্রিকায়।'

'হোক। আম্রিকা আর আফ্রিকা একই কথা। আপনার সবকিছুই তো ব্রিটিশ। আপনার স্কচ হুইস্কি স্কটল্যান্ডের। আপনার ড্রাই জিন এসেছে লন্ডন থেকে।'

'আমার সব ব্রিটিশ। শুধু আমার মোটি পাকিস্তানি।'

'না। আমিও ব্রিটিশ। শুধু আপনার বিবি পাকিস্তানি।'

'হ্যাঁ। ফাকরা পাকিস্তানি আছে। বোরকা আর পর্দার আড়ালে সে সহিসালামতে আছে।'

'আর আপনার বাচ্চা দুটো? আলি আর ইয়াসমিন?'

'মা পাকিস্তানি। বাপ ব্রিটিশ। বোঝোই কী হতে পারে?'

খচ্চর। মনে মনে বললেন আকলিম। কণ্ঠ উঁচিয়ে বললেন, 'না, খুব আদব-কায়দা আপনার বাচ্চাদের। মাশা আল্লাহ।'

'দুজনকেই বিয়ে দিয়েছি। দুজনেই নিজের মতো করে আছে। ভালো না?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। খুব ভালো। আপনি প্রেসিডেন্ট হবেন? আইয়ুব খান তো আপনাকে খুব পছন্দ করেন।'

'করতেই হবে। আমি যদি তোমার হৃদয় জয় করতে পারি, তাহলে কার হৃদয় আমি জয় করতে পারব না। বলো?'

'তা তো বটেই।'

'প্রেসিডেন্ট বলেন, আমার মতো আর ছয়টা জেনারেল যদি থাকত, তাহলে পৃথিবীটাই সুন্দর হয়ে যেত।'

'তাহলে আপনি কি তাঁর সঙ্গে গাদ্দারি করছেন?'

'না, মোটি। আমি তাঁকে সাহায্য করছি। তিনি তো পারছেন না। জনতা তাঁকে খেয়ে ফেলতে চায়। সারা পাকিস্তান জ্বলছে। পূর্ব পাকিস্তান জ্বলছে। পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবকে আগরতলা মামলা থেকে মুক্তি দিতে প্রেসিডেন্ট বাধ্য হয়েছেন। সমস্ত পূর্ব পাকিস্তান হরতালে ধর্মঘটে মিছিলে সয়লাব হয়ে গিয়েছিল। পশ্চিম পাকিস্তান পুড়ছে। ভুট্টো আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, পুরো পূর্ব পাকিস্তানে। সেই আগুনে তিনিও পুড়ে যেতে বসেছেন। আমি তাঁকে উদ্ধার করতে এগিয়ে যাচ্ছি। এই তো! এসো, আমরা আমাদের কাজ করি। আরেকটু নিচে, মোটি! আহা, আমাকে স্বর্গের সুখ দিতে জানো তুমি। আর কেউ এটা জানে না! আর কেউ না!'

'কিন্তু আপনি বলেছেন, আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ হলে সেনাবাহিনী তাতে জড়াবে না। আর তিনটা শহরে যে মার্শাল ল দেবার কথা উঠল, আপনি তাতে না করে দিলেন।'

'মোটি, তুমি বেশি বলছ। তোমার মুখ তো কথা বলার জন্য নয়। ওটা আদর করার জন্য। শোনো, তিনটা শহরে মার্শাল ল হলে তার প্রধান কে হবে? আইয়ুব ফিল্ড মার্শাল হতে পারেন। কিন্তু তিনি বেসামরিক লোক। সবই হবে। কিন্তু সবকিছু হবে তোমার আগা জানির অধীনে। আহ, আরও জোরে...আস্তে আস্তে...মোটি...'

'ভুট্টো কী করছেন?'

'উফ। এই সময় তুমি ওই বাচ্চা পার্টির বাচ্চা লোকটার নাম নিলে? আমি জানি, তোমার সঙ্গে তাঁর অনেক দিনের পরিচয়। রাওয়ালপিন্ডি ক্লাবের পার্টিতে।'

'পার্টিটা রাওয়ালপিন্ডি ক্লাবেই হওয়ার কথা ছিল। পরে সেটা ফ্ল্যাম্যান'স হোটেলে শিফট করা হয়েছিল।'

'ভুট্টো তোমাকে পছন্দ করেছিলেন। তুমিও তাঁকে পছন্দ করেছিলে।'

'আপনি জানেন, আমার ক্ষুধা অনিঃশেষ। সেই রাতে ভুট্টোর সঙ্গে তোজাম্মেলের মারামারি লেগে গিয়েছিল, আপনি জানেন। তোজাম্মেল আমার রক্ষকের ভূমিকা নিয়ে ফেলল। ভুট্টোকে মার দিয়ে দিল। ওরা দুজনই আমাকে হোটেল থেকে গাড়ি করে বাড়ি পৌঁছে দিতে চেয়েছিল।'

'তুমি আমার আনন্দ নষ্ট করে দিলে ভুট্টোর নাম নিয়ে।'

'কেন। ভুট্টো তো আর আমাকে ভালোবাসেন না। তিনি আমার জায়ের দিকে নজর দিয়েছিলেন।'

'ভুট্টোকে আমি বলেছি, প্রেসিডেন্টের গোলটেবিল বৈঠকে যোগ না দিতে। আইয়ুব খানের দিন শেষ। অকারণে তিনি শেষ চেষ্টা করছেন। তাতে ফল ফলবে না। সারা দেশ জ্বলছে। আরও জ্বলবে।'

'কিন্তু মুজিব গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দেওয়ায় পশ্চিম পাকিস্তানেও তো আন্দোলন থেমে গেছে।'

'মুজিব লোকটা ডেঞ্জারাস। সে পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র নেতা। সম্ভবত এখন সে পাকিস্তানেরও সবচেয়ে বড় নেতা। এ জন্য আমি তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছি। আমি মার্শাল ল দেব। তখন যেন সে পূর্ব

পাকিস্তানে গন্ডগোল না করে।'

'আপনার শরীর ঠান্ডা হয়ে গেছে।'

'তুমি আমার মনকে ডাইভার্ট করেছ। মন ছাড়া শরীর চলে না, মোটি।'

'ওকে, এবার মন দিন। দেখুন। আপনার মোটি আপনাকে কত আদরই না করছে...তাকান...'

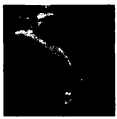

এরপর ইয়াহিয়া জারি করলেন সামরিক শাসন, দখল করলেন ক্ষমতা। সেই সময়ের কথা—

ইয়াহিয়া খান ধন্দে পড়েছেন।

টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে ভাষণ দিতে হবে। তিনি কোন পোশাক পরবেন?

আকলিম ওরফে রানি তাঁকে বলেছেন কালো রঙের কোট-প্যান্ট টাই পরতে। তাঁরও ভেতরে ভেতরে তেমনি ইচ্ছা। তাঁকে বেসামরিক মানুষ মনে হোক, প্রেমিক মানুষ মনে হোক, এটা তিনি চান। আবার তিনি ভাষণ দিচ্ছেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে। সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে। সামরিক পোশাক ছাড়া আবির্ভূত হওয়াটা সংগত হবে না।

তিনি তাঁর সামরিক পোশাকই পরলেন। বুকভরা মেডেল আর মেডেল। শত রকমের ব্যাজ। কাঁধে ব্যাজ, গলা থেকে ঝুলছে মেডেল। এক কাঁধ থেকে আরেক বগলের নিচ দিয়ে নেমে গেছে চামড়ার বেল্ট।

আইয়ুব খানও একটা ভাষণ দিয়েছেন। সেটাও রেকর্ড করা হয়েছে। ইয়াহিয়া সেই ভাষণটা পুরোপুরি শুনলেন। কোনো আলতু-ফালতু কথা তাঁকে বলতে দেওয়া হবে না।

ইয়াহিয়া খান এর আগেই আইয়ুব খানের সঙ্গে দেখা করেছেন। তাঁদের মধ্যে বোঝাপড়া হয়ে গেছে কী হবে, কী করতে হবে। আইয়ুব খান ভাষণ

দিয়ে ইয়াহিয়াকে আমন্ত্রণ জানাবেন দেশ উদ্ধারে এগিয়ে আসতে। ইয়াহিয়া খান জেনারেলদের ডেকে পরিকল্পনা পাকাও করেছেন। তারিখ ঠিক হয়েছে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ।

এদিকে ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তানের নতুন গভর্নর হিসেবে শপথ নিলেন এম এন হুদা। ২৩ মার্চ।

সেখানে এক জেনারেল আরেক জেনারেলের কানের কাছে বলছেন, 'এসব কী হচ্ছে? এই নাটকে আমরা কেন অভিনয় করছি। আমরা না এক দিন পরেই সামরিক শাসন জারি করতে যাচ্ছি?'

দ্বিতীয় জেনারেল তাঁর কানে জবাব ঢেলে দিচ্ছেন, 'দুনিয়াটা একটা রঙ্গমঞ্চ। আমরা সবাই অভিনেতা। ঘটনা যা ঘটছে আমরা দেখতে থাকি।'

রেডিও-টিভিতে দুটো ভাষণই একযোগে প্রচারিত হবে। কিন্তু সরাসরি তো আর নয়। রেকর্ড করে প্রচার করতে হবে। আর একটা টিভি স্টেশন করাচিতে, আরেকটা ঢাকায়। আগেভাগে রেকর্ড করে সেসব আবার টেলিভিশন সেন্টারে পাঠাতে হবে বিশেষ বিমানে করে। হ্যাপা কম নয়। আবার ২৫ মার্চ বিকেলের আগে যেন কাকপক্ষীও টের না পায় টেপে কী আছে।

ইয়াহিয়া খান প্রথমে দেখে নিলেন আইয়ুব খান কী বলেছেন। তাঁকে একটা কাগজে প্রেসিডেন্টের ভাষণের টাইপ করা কপি দেওয়া হয়েছে। সেটা এক হাত দিয়ে তিনি ওল্টাচ্ছেন। পৃষ্ঠাটা বেশি পাতলা আর পিচ্ছিল, উঠতে চায় না। তিনি ডান হাতের তর্জনীতে থুতু মেখে নিলেন। আরেক হাত দিয়ে পিঠের দুর্গমতম স্থানে চুলকানোর চেষ্টা করতে লাগলেন, হঠাৎ জায়গাটা চুলকাচ্ছে কেন!

প্রেসিডেন্ট ভবন, ২৪ শে মার্চ ১৯৬৯।

'প্রিয় জেনারেল ইয়াহিয়া,

'গভীর বেদনার সাথে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, দেশে সমস্ত প্রশাসন ও শাসনতান্ত্রিক কর্তৃত্ব কার্যকারিতা হারাইয়া ফেলিয়াছে।'

ইয়াহিয়া মৃদু হাসলেন। সে খবর তিনি রাখছেন। পশ্চিম পাকিস্তান, পূর্ব পাকিস্তান একযোগে জ্বলছে। জ্বলারই কথা।

'যদি বর্তমানের আশঙ্কাজনক গতিতে অবস্থার অবনতি ঘটিতে থাকে, তাহা হইলে সভ্যভাবে জীবনধারণ অসম্ভব হইয়া পড়িবে।

'ক্ষমতা ত্যাগ করিয়া দেশরক্ষা বাহিনীর কাছে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করা ছাড়া আমার কোনো বিকল্প নাই। বর্তমান সময়ে দেশের পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণের জন্য দেশরক্ষা বাহিনীই একমাত্র কার্যকর ও আইনানুগ প্রতিষ্ঠান। খোদা চাহে তো অবস্থার পরিবর্তন সাধনপূর্বক পরিপূর্ণ বিশৃঙ্খলা ও ধ্বংসের হাত হইতে দেশকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা তাহাদের রহিয়াছে। একমাত্র তাহারাই দেশে সুস্থতা ফিরাইয়া আনিতে পারে এবং বেসামরিক ও শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশকে অগ্রগতির পথে ফিরাইয়া নিতে পারে।...

'শুধু বিদেশি আগ্রাসন নয়, বরং অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা হইতে দেশকে রক্ষা করিবার আইনগত ও শাসনতান্ত্রিক দায়িত্ব আপনার।'

ইয়াহিয়া খান পিঠ চুলকাতে চুলকাতে হাসেন। তাই তো। শাসনতান্ত্রিক দায়িত্বও তো আমার! বন্দুকের নলই সকল ক্ষমতার উৎস। আকলিম ওরফে রানি অবশ্য সে কথা মানেন না। তিনি বলেন, 'চামড়ার নলই সকল ক্ষমতার উৎস। তুমি চামড়ার নলের নিয়ন্ত্রণ নাও, বাকি ক্ষমতা তোমার কাছে আপনা-আপনিই আসবে।'

'প্রতিটি সৈনিক, নাবিক ও বৈমানিকের নিকট আপনি এই কথা পৌঁছাইয়া দিবেন যে, তাহাদের সুপ্রিম কমান্ডার হিসাবে তাহাদের সহিত সম্পর্কিত হওয়াতে আমি গর্বিত, সেই জন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব।

'তাহাদের জানা উচিত, বর্তমান সংকটাপন্ন মুহূর্তে তাহাদিগকে পাকিস্তানের রক্ষক হিসাবে কাজ করিতে হইবে। তাহাদের আচরণ ও কাজ ইসলামের নীতিমালা ও জনগণের স্বার্থ রক্ষার মনোবৃত্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। দীর্ঘকাল ধরিয়া পাকিস্তানের সাহসী ও অনুপ্রাণিত জনগণের খেদমত করিতে পারিয়া আমি পরম সম্মানিত বোধ করিতেছি। আল্লাহ তাঁহাদিগকে অধিকতর অগ্রগতি ও গৌরবের পথে পরিচালিত করুন।

'আপনার দ্বিধাহীন আনুগত্যের কথাও আমি পরম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিতেছি। আমি জানি, আপনার সমগ্র জীবনে দেশপ্রেমই হইতেছে সর্বময় প্রেরণার উৎস। আমি আপনার সাফল্য এবং আমার দেশবাসীর কল্যাণ ও সুখের জন্য দোয়া করি। খোদা হাফেজ।

'আপনার বিশ্বস্ত

'স্বাক্ষর/ এম এ খান'

ইয়াহিয়া খানের পিঠের চুলকানিটা সঞ্চরণশীল। সেটা আগে ছিল ডান পাশে। এবার চলে গেল বাম পাশে।

তিনি চুলকানোর জন্য তাঁর সার্বক্ষণিক সঙ্গী লাঠিটাকে ব্যবহার করবেন কি?

আইয়ুব খান বলেছেন, দেশপ্রেমই হইতেছে সর্বময় প্রেরণার উৎস। কথাটা কি ঠিক?

দেশ আগে ছিল ব্রিটিশ ভারত। তিনি সেই দেশের জন্য লড়েছেন।

তারপর দেশ হলো পাকিস্তান। তিনি তার জন্যও লড়েছেন।

পাকিস্তান সৃষ্টিকর্তার অপরূপ সৃষ্টি। সবচেয়ে সুন্দর পাকিস্তানের নারীরা। তিনি পাকিস্তানের নারীদের ভালোবাসেন।

তারাই তাঁর সমস্ত কাজকর্মের প্রেরণার উৎস।

তারা পাকিস্তানেরই সৌন্দর্যের প্রতীক।

কাজেই পাকিস্তানপ্রেমই তাঁর প্রেরণার উৎস।

এবার তিনি নিজের ভাষণটা দেবেন।

ভাষণ রেকর্ড হচ্ছে সিএনসির অফিসে।

লাইট জ্বলে উঠল।

ইয়াহিয়া বললেন, 'এত আলো কেন? আলো কমাও।'

ক্যামেরাম্যান থরথর করে কাঁপছে।

'আলো কমাও।'

আলো কমানো হলো।

এই সময় কেউ তাঁকে এগিয়ে বলতে সাহস করল না যে, আলো কম থাকলে টেলিভিশনে তাঁর মুখটা ভালো দেখাবে না।

ইয়াহিয়া দৃঢ়তার সঙ্গে পাঠ করতে লাগলেন—হুইস্কির কারণে তাঁর কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তাটা ফুটল চমৎকার—

'আমি এটা স্পষ্টভাবে পরিষ্কার করতে চাই যে একটা সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি ছাড়া আমার আর কোনো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নাই। একটি সুষ্ঠু ও গঠনমূলক রাজনৈতিক জীবন ও প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সবার আগে দরকার একটা সমর্থ, পরিচ্ছন্ন ও সৎ প্রশাসন। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ হবে দেশকে

একটা কার্যকর সংবিধান দেওয়া এবং জনগণ যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার ভেতর দিয়ে যাচ্ছে, তার চূড়ান্ত সমাধান দেওয়া।'

পরের দিন পিন্ডি থেকে আমেরিকার দূতাবাস ওয়াশিংটনে একটা বার্তা পাঠাল। তাতে তারা বলল, 'ইয়াহিয়া খান খুব বেশি মদ্যপান করেন। তিনি একজন নারী-আসক্ত। তাঁর সম্পর্কে অভিযোগ আছে, এবং সম্ভবত সেই অভিযোগ সত্য যে, তিনি তাঁর অধস্তন অফিসারদের স্ত্রীদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেন।'

আকলিমের ফ্ল্যাটে এসেছেন ম্যাডাম নুরজাহান। মালেকা-ই-তারান্নুম। পাকিস্তানের কোকিল। রুপালি পর্দার সবচেয়ে সুন্দর মুখ। হাজারো পুরুষের রাতের নিদ্রাহীনতা, দিবাস্বপ্ন।

সোনালি বর্ডারের রুপালি চীনা কাপে চা দেওয়া হয়েছে তাঁকে। চায়ে মসলা মেশানো হয়েছে। আকলিম নিজে কাপে ঠোঁট রাখলেন। এলাচের গন্ধটা একটু বেশি হয়েছে। তাঁর পরিচারিকাটি এখনো নতুন। এই চা বানানোর রেসিপি রপ্ত করে উঠতে পারেনি।

পাকিস্তানের সিনেমা-জগতের সবচেয়ে উজ্জ্বল তারাটিকে নিজের ঘরে দেখে নিজের চোখকে যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না আকলিম। নীল রঙের একটা কামিজ, তাতে সোনালি রঙের বর্ডার, সোনালি সুতার কাজ বুকের কাছটায়। গলার কাছে একটা জড়ির কাজ করা ওড়না। মাথার চুল খোঁপা করা, কয়েকটা চূর্ণ অলক কানের কাছে। চোখের নিচে খানিকটা কালি। ঠোঁটে লাল লিপস্টিক। উজ্জ্বল বড় বড় চোখ। মায়ায় ভরা। দেহাকৃতি পৃথুলা। কানে ঝুমকা, গলায় ভারী সোনার চেইন, হাতের বালাও সোনার এবং ভারী।

আকলিম বললেন, 'ম্যাডাম, আপনার তবিয়ত ভালো তো।'

'আলহামদুলিল্লাহ।' নুরজাহান তাঁর লিপস্টিক বাঁচিয়ে ঠোঁট ফাঁক করে বললেন।

'আপনি আমার গরিবখানায় পদধূলি দিয়েছেন। আমি খুব খুশি হয়েছি। বলুন, আমি আপনার জন্য কী করতে পারি?'

'আমি আসলে একটু বিপদে পড়েই এসেছি। আমার ইনকাম ট্যাক্স নিয়ে ঝামেলা হচ্ছে। কত টাকা আর ইনকাম করি বলুন।'

'তা ঠিক।'

'আর গতর খাটা টাকা। রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে শুটিং করতে হয়। টাকাটা উশুল করি মেহনত দিয়ে। এখন মার্শাল ল সরকার এসে অকারণ চাপ দিচ্ছে। এ বছরের ইনকাম ট্যাক্স না হয় বাড়িয়ে দিলাম, গত পাঁচ বছরের ফাইল নিয়ে টানাটানি করছে।'

'হুঁ। এ নেহাতই বাড়াবাড়ি।' আকলিম বললেন। 'নিন, চা নিন। মসলা চা আপনার কণ্ঠের জন্য উপকার দেবে।'

বলতে বলতে ভাবলেন, গতর খাটা টাকা, কথাটা ম্যাডাম খারাপ বলেননি। এই মেয়েগুলোর এইটাই সমস্যা। তারা শুধু গতর খাটায়। গতর ছাড়া যে অন্য কিছু আছে, যা খাটানো যায়, এদের শেখানো যায় না। ম্যাডাম অবশ্য শুধু তার গতর খাটান না, তাঁর সহজাত প্রতিভাও খাটান। তিনি গান করেন। তাঁর গান মানুষের মুখে মুখে ফেরে। ১৯৬৫ সালে ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধের সময় তিনি সৈনিকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য কতগুলো গান গেয়েছিলেন। আহা। কী চমৎকারই তাঁর গানগুলো!

'মেরা মেহি চাইল চাবেলা
কারনালি নি জারনেল নি
(আমার প্রেমিক হয় একজন কর্নেল, নয়তো জেনারেল)
মেরা চান মেহি কাপ্তান
(আমার চাঁদ আমার ক্যাপ্টেন)।
এ ওয়াতান এ ওয়াতান তেরি লালকার পে...'

নুরজাহানের কত দেশপ্রেমের গান, সৈনিকপ্রেমের গান মানুষের মুখে মুখে ফিরেছে। তাঁর চেয়ে বড় দেশপ্রেমিক আর কে হতে পারে। আর কিনা সামরিক শাসনের এই দিনগুলোতে তাঁর ওপর ইনকাম ট্যাক্সওয়ালাদের অত্যাচার। এ হতেই পারে না।

আর আগা জানি তাঁর গান খুবই পছন্দ করেন। আগা জানি কেবল একজন সৈনিক নন। তিনি একজন শিল্প-সমঝদার মানুষ। তাঁর আছে কবি-হৃদয়। তাঁর আছে সংগীত উপভোগের সুরুচি। আর তিনি একজন প্রেমিক পুরুষ। নারীর সৌন্দর্য ও কামকলাকে তিনি তারিফ করতে জানেন। এটা খুব কম পুরুষই জানে। কম পুরুষই জীবনে কামকে কলা হিসেবে দেখেছে, তার রস উপভোগ করতে পেরেছে। বছর বছর সন্তান বিয়োনোর ভার বহন করার কষ্টটুকু ছাড়া আর কীই-বা পারে তাদের নারীরা! ছয় সন্তানের জননী আকলিম বোঝেন সেই বেদনা। নুরজাহানও গন্ডায় গন্ডায় সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। একজন শিল্পীর যে এর চেয়েও বেশি কিছু প্রাপ্য, সেটা তাঁর প্রাক্তন স্বামী শওকত বোঝেনি। এখন কি নুরজাহানের কোনো স্বামী আছে? ইজাজ কি তাঁর স্বামী? নাকি...

নুরজাহান চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, 'আপনার অনেক ক্ষমতা। আপনার সঙ্গে প্রেসিডেন্টের যোগাযোগ আছে। আপনি কি মেহেরবানি করে তাঁর সঙ্গে আমার একটু দেখা করিয়ে দেবেন।'

কেন নয়, মনে মনে বললেন আকলিম। এইটাই তো আমার কাজ। দেখা করিয়ে দেওয়া। এই করেই তো আমি চালাচ্ছি। কিছু অর্থবিত্তের মুখ দেখছি। আমার সন্তানেরা লেখাপড়া করছে, বড় হচ্ছে, মানুষ হচ্ছে।

'জি, আমি চেষ্টা করব। আপনি একদম চিন্তা করবেন না। আপনার টেলিফোন নম্বরটি আমাকে দিয়ে যান। আমি আগাজিকে আপনার কথা বলব। তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে সময় দেবেন। তাঁর হৃদয় বিশাল।'

আকলিম আখতার ওরফে জেনারেল রানি পরে চিরটা কাল পস্তাবেন, কেন তিনি নুরজাহানকে তাঁর আগাজির কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। নুরজাহান খ্যাতিমানা, নুরজাহান সিনেমার নায়িকা এবং পাকিস্তানের এক নম্বর গায়িকা, আকলিম না হয় ছলাকলা জানেন, মাথা খাটাতে জানেন, কিন্তু নুরজাহান তো খাটাতে জানেন তাঁর জিহ্বা, কারণ তাঁর কণ্ঠ। যাঁর কণ্ঠের জাদুতে পুরো পাকিস্তান এমনকি ইন্ডিয়া বুঁদ হয়ে আছে, ইয়াহিয়া খানকে মোহিত করা তাঁর জন্য মোটেও কোনো কষ্টের কাজ নয়।

আকলিম আখতার আর নুরজাহান দুটো আলাদা গাড়িতে করে ঢুকলেন রাষ্ট্রপতিতালয়ে।

প্রেসিডেন্ট তখন ব্যস্ত পররাষ্ট্রবিষয়ক জরুরি ব্যাপার নিয়ে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন আসবেন। এটা পাকিস্তানের জন্য সবচেয়ে বড় ঘটনা হতে যাচ্ছে। তাঁর পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্রসচিব সবাই এসেছেন তাঁর কক্ষে। এই সময় তাঁর ইন্টারকম ফোন বেজে উঠল।

'স্যার, জেনারেল রানি এসেছেন।'

'তিনি কি একা এসেছেন?'

'স্যার। সঙ্গে ম্যাডাম নুরজাহানও এসেছেন।'

'তাদের আমার খাস বৈঠকখানায় বসাও। আমি আসছি।'

তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সচিব প্রমুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনারা একটু চা খান। আমার এখানকার বটি কাবাব খুব ভালো। আমি একটা জরুরি মিটিং সেরে আসছি।'

প্রেসিডেন্ট তাঁর খাস বৈঠকখানায় এলেন।

সেখানে বসে আছেন দুই রানি। জেনারেল রানি আর গানের রানি।

এক আকাশে দুই চাঁদ? এ-ও কি সম্ভব?

দুজনই সেজেছেন প্রতিযোগিতা করে। যেন এ বলছে আমায় দেখো, ও বলছে আমায় দেখো।

জেনারেল রানি পরেছেন কালো কামিজ। নুরজাহান পরেছেন লাল। তাঁদের মুখ মেকআপে নিষ্কলঙ্ক চাঁদের মতো ঝকঝক করছে।

প্রেসিডেন্ট হাউসের এই ঘরের পুরোটা দেয়াল কাঠে মোড়া। মেঝেতে লাল গালিচা। ছাদে কাঠের কারুকাজ। ঝাড়বাতির অপরূপ আলো কক্ষটাকে মায়াবী করে রাখে।

আকলিম বলেন, 'আগা জানি, আপনার জন্য আজকের দিনে এই আমার উপহার। এই মালেকা-ই-তারান্নুম।'

ইয়াহিয়া হাসলেন। তিনি বললেন, 'ম্যাডাম নুরজাহান, বলুন আমি কীভাবে আপনার কাজে লাগতে পারি।'

নুরজাহান বললেন, 'আমার ইনকাম ট্যাক্স ফাইল নিয়ে আমাকে অকারণে হয়রানি করা হচ্ছে। আমি আপনার কাছ থেকে ইনসাফ চাইতে এসেছি।'

ইয়াহিয়া হাসিমুখে বললেন, 'ইনসাফ করাটাই তো আমাদের কাজ। আমরা মার্শাল ল দিয়েছিই এই দেশে যত অন্যায়-অনাচার আছে সব দূর করব বলে। ইনকাম ট্যাক্স হচ্ছে দুর্নীতির আখড়া। যে অফিসার আপনাকে

হয়রানি করছে, তার বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এখন আপনি কি আমাকে ওই গানটা শোনাতে পারেন...মেরি চিচি ডা মেরি চালা মেহি...কী পান করবেন? আমার কালেকশন ভালো। হুইস্কি, ব্রান্ডি, ভদকা, ওয়াইন—সব আছে। আমি হুইস্কি খাই। পানি ছাড়া, এক টুকরো বরফ দিয়ে। খেতে পারেন। ভালো। সিঙ্গেল মল্ট।'

ইয়াহিয়া খান একবার নুরজাহানের মুখের দিকে তাকান। একবার আকলিমের মুখের দিকে। আকলিম নিজেকে কি একটু উপেক্ষিত ভাবছেন? আকলিম কী খান, সেটা তাঁর আগা জানি ভালোই জানেন। কিন্তু তিনি তাঁকে কিছুই খেতে বলছেন না কেন?

না। আগা জানির আদব-সহবতের কোনো তুলনা নেই। তিনি আকলিমের জন্য তাঁর প্রিয় ককটেল ড্রিংকস নিজ হাতে বানিয়ে নিয়ে কাছে এলেন। আকলিমের হাতে তুলে দিলেন।

নুরজাহান লজ্জা পাচ্ছেন। তিনি ড্রিংক নিতে চাইছেন না।

পাক না খানিকটা লজ্জা! লজ্জা নারীর ভূষণ। কিন্তু নারী সুন্দর ভূষণ ছাড়াই। মনে মনে ভাবলেন ইয়াহিয়া।

লাজুকতা ছিল ইয়াহিয়া খানেরও ভূষণ।

আইয়ুব খানের তুলনায় সব দিক থেকেই তিনি ছিলেন পিছিয়ে।

লম্বায় তিনি ছোট আইয়ুব খানের তুলনায়। আইয়ুব খান ছিলেন হ্যান্ডসাম। ইয়াহিয়া খান স্থূল। আইয়ুব খানের ছিল পেটানো শরীর।

আইয়ুব খান ক্ষমতা নেবার আগে নিজেকে তৈরি করে নিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে শিক্ষিত করে গড়ে তুলেছিলেন। ইয়াহিয়া ক্ষমতায় এসেছেন হঠাৎ করে। প্রস্তুতিবিহীন।

কিন্তু ক্ষমতা মানুষকে নির্লজ্জ ও সাহসী করে তোলে। তিনি এখন যথেষ্টই আড়ষ্টতাবিহীন। লজ্জা জিনিসটাও তাঁর উঠে যাচ্ছে।

তখনো তিনি ক্ষমতা নেননি। বেতার-টিভির জন্য ভাষণ রেকর্ড হচ্ছে সিএনসির রুমে। এই সময়েই বেজে উঠল ফোন। ফোন করেছেন আইয়ুবের একজন মন্ত্রী। ইয়াহিয়াকে তিনি বললেন, 'আপনার সেবা করার সুযোগ পেলে আমি ধন্য হয়ে যাব।'

ইয়াহিয়া তখন ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। কারণ, তাঁর ভাষণ রেকর্ডের ঘটনাটা

ছিল টপ সিক্রেট। তিনি কখন কোথায় ভাষণ রেকর্ড করবেন, সেটা কাকপক্ষীরও জানার কথা নয়। সেটা কীভাবে একজন মন্ত্রী জেনে গেলেন।

প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেবার ১০ দিনের মাথায় তিনি সংবাদ সম্মেলনে ভাষণ দেন। পশ্চিম পাকিস্তানের বাঘা বাঘা সম্পাদকেরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

প্রথমে ছিল লিখিত ভাষণ। সেটা তিনি সামরিক কায়দায় দিয়ে গেলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ভারী। সারাক্ষণ মদের ওপরে থাকা গলায় ভারিক্কি চাল আপনা-আপনিই আসে। কিন্তু প্রশ্ন-উত্তরের সময় তিনি ছিলেন প্রফুল্ল। মজা করছিলেন, ছিলেন আত্মবিশ্বাসী। হেসে হেসে উত্তর দিচ্ছিলেন। একেবারে আইয়ুব খানের বিপরীত। পুরো সংবাদ সম্মেলনে তাঁর বাণী একটাই। তিনি একজন সৈনিক। সৈনিক হিসেবেই একটা দায়িত্ব তাঁর ওপরে এসে পৌঁছেছে। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় সেটা পালন করে তিনি আবার তাঁর সৈনিক পেশায় ফিরে যাবেন। তিনি সাংবাদিকদের সব প্রশ্নেরই উত্তর দিচ্ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে চায়ের টেবিলে হাসিঠাট্টায় যোগ দিচ্ছিলেন। আইয়ুব খানের সম্পূর্ণ উল্টো রূপে দেখা গেল তাঁকে। আইয়ুব খান সাংবাদিকদের সঙ্গে সাংঘাতিক বাজে ব্যবহার করতেন।

তবে চাকরি চলে গেল মজিদ মুফতির। তিনি এই সংবাদ সম্মেলন ডেকেছিলেন তথ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তা হিসেবে। মূল কর্তা আলতাফ গওহর আইয়ুব খানের মুখপাত্র ছিলেন বলে তাঁকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে আগেই। মজিদ মুফতি সব সময় হাসছিলেন। তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একজন সম্পাদকের পরিচয় করিয়ে দেবার সময় নিজের ৩২টা দাঁত বের করে ছিলেন, আর ছবিতে সেই ৩২টা দাঁতও দেখা যাচ্ছিল। এটা পরের দিনের কাগজে ছাপা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইয়াহিয়া তাঁর চাকরি নট করে দিলেন। কোনো প্রচার কর্মকর্তার ৩২টা দাঁত প্রেসিডেন্টের পাশে দেখা যেতে পারে না।

আইয়ুব খানের চামচা এক সম্পাদককে দেখা গেল প্রথম দিন থেকেই ইয়াহিয়া খানের পক্ষ নিচ্ছেন। ইয়াহিয়া খান প্রথম দিন হেসেছিলেন। দ্বিতীয় দিন থেকে তিনি সেই চামচার লেখা পছন্দ করতে শুরু করলেন। তেল এমন এক মহৌষধ, যা কখনো বেশি হয় না। যা কখনো ব্যর্থ হয় না। তেল দেবার সময় অন্যে কী বলল তা দেখার চেষ্টা করতে নাই।

ইয়াহিয়া খান ঢাকা ঘুরে গেলেন।

ঢাকার পাশে টর্নেডো হয়েছে। ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে, গাছপালা উড়ে গেছে, মুহূর্তে উজাড় গ্রাম, টিউবওয়েল উড়ে গেছে ৫০০ গজ দূরে, গাছের ডালে লটকে আছে তার মাথা। এই সুযোগ! ইয়াহিয়া গেলেন ঢাকায়। গেলেন টর্নেডো-বিধ্বস্ত গ্রাম দেখতে। সেখানে তিনি সাংবাদিকদের সুযোগ দিলেন তাঁর কাছাকাছি আসার। বিমানবন্দরেই সাংবাদিকেরা তাঁকে প্রশ্ন করার সুযোগ পেলেন আর তিনিও উত্তর দিতে থাকলেন :

'রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা কবে নাগাদ শেষ করবেন?'

'এটা আপনারাই ভেবে বলুন। আমি দ্রুত এগোচ্ছি।'

'আপনি কি আপনার নির্বাচন কর্মসূচি অব্যাহত রেখেছেন?'

'আমি কখনো নির্বাচনী কর্মসূচি দেই নাই। আমার মুখে কথা তুলে দেবেন না। আপনার কথা আমাকে দিয়ে বলাতে চাইবেন না।'

'সাধারণ নির্বাচন কবে হবে?'

'এটা আপনাদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

'আপনি কি কোনো সরকার-পদ্ধতি কল্পনা করতে পারছেন, যা উঠে আসবে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আপনার আলোচনা থেকে?'

'আমার কাছে কোনো জাদুর কাঠি নাই।'

ঢাকার সংবাদপত্রের সম্পাদকদের সঙ্গেও তিনি মিলিত হন। আবিদুর রহমান নামের এক সাংবাদিক তাঁকে 'ইয়াহিয়া চাচা' বলে সম্বোধন করলেন। তিনি সেটাকে নিরুৎসাহিত করলেন না।

ঢাকাতেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো এক পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রীর। বাঙালি এই মহিলাটির গাত্রবর্ণ শ্যামলা। এ দেশে শ্যামল রং রমণীর সুনাম শুনেছি, বিড়বিড় করলেন ইয়াহিয়া।

মিসেস শামীম কে এন হুসেন যেন বেদুইন কন্যা। জিপসিদের মেয়ে। বাংলার বেদেনিদের মতো কোমর, তাঁর চলাচল।

তিনি চমৎকার ইংরেজি বলেন।

ইয়াহিয়া খান শেক্‌সপিয়ারের ভক্ত। তিনি মাঝেমধ্যে শেক্‌সপিয়ারের নাটকের পাঠ আয়োজন করেন। তিনি নিজেও কোনো একটা চরিত্রের সংলাপ নিজের ঠোঁটে তুলে নেন। অন্য অফিসাররাও কোনো-না-কোনো

চরিত্র সেজে সংলাপ আওড়ান। ইয়াহিয়ার প্রিয় চরিত্র অ্যান্টনিও।

শামীমকে দেখেই তিনি বিড়বিড় করতে লাগলেন, 'That man that hath a tongue, I say is no man, if with his tongue he cannot win a woman.'

'সেই পুরুষ কোনো পুরুষই নয়, যার জিব আছে অথচ যে তার জিব দিয়ে কোনো নারীকে জয় করতে পারে না।'

শামীম—তাঁর বুকের আঁচল গড়িয়ে পড়ছে মেঝেতে—বললেন, 'টু জেন্টলম্যান অব ভেরোনা—শেক্‌সপিয়ার।'

ব্যস। ইয়াহিয়া খান প্রেমে পড়ে গেলেন। এ কে? পাকিস্তানে তিনি কাদের সঙ্গে মিশছেন! আকলিম? নুরজাহান? এদের কেউ কি শেক্‌সপিয়ার থেকে আবৃত্তি করতে পারবে? হ্যাঁ। নুরজাহান গান করতে পারে। শিল্পের এই শাখাতেও জাদু আছে। কিন্তু শেক্‌সপিয়ার তো শেক্‌সপিয়ারই। এই ব্ল্যাক বিউটি ছাড়া আর কেই-বা তাকে শেক্‌সপিয়ার শোনাতে পারবে?

প্রেসিডেন্ট হাউসে মদের বন্যা বয়ে চলেছে।

নাচ-গান, হইহুল্লোড় চলছে দেদার।

এর মধ্যে কে এই ছলনাময়ী নারী, যার কালো মুখে বিদ্যুতের রেখা। ঝকঝক করছে দাঁতের সারি। জ্বলে উঠছে উজ্জ্বল দুটো চোখের তারা। ও আমার খোদা, এই তো সেই, যাকে আমি সারাটা জীবন ধরে খুঁজেছি। যার জন্য আমার এই বেড়ে ওঠা, দেরাদুনে ট্রেনিং নেওয়া, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে যাওয়া। এই তো সেই নারী, যাকে পাব বলে আমি মার্শাল ল দিয়েছি, যাকে পাব বলে প্রেসিডেন্ট হয়েছি।

'আপনি কে গো?' প্রেসিডেন্ট তাঁর অসম্ভব ভারী গলায় বলেন। মদের কারণে কথা সামান্য জড়িয়ে যাচ্ছে।

'আমি? আমি মিসেস এম এন হোসেন।'

'সে কি! মিসেস এম এন হোসেন? আপনার নাম নাই?'

'আছে একটা। শামীম।'

'শামীম! শামীম! সুন্দর নাম। নামের চেয়েও সুন্দর তোমার রূপ। তারও চেয়ে সুন্দর তোমার বিদ্যা। তোমার কালচার। তোমার স্বামী কী করেন?'

'পুলিশের এসপি।'

'পুলিশের এসপি। এমন অপরূপা যাঁর স্ত্রী, তিনি কেন পুলিশের এসপি হয়ে এই জল-জংলার দেশে পড়ে থাকবেন। তুমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর গোলাপ, তুমি থাকবে ফুল বাগানে। তোমাকে আমি পিন্ডি নিয়ে যাব। তোমার হাজব্যান্ডকে আমি প্রমোশন দেব।'

তিনি সঙ্গে সঙ্গে ডাকলেন জেনারেল ইসহাককে। 'ইসহাক, ইসহাক।'

'ইয়েস স্যার।'

'দেশে এখন মার্শাল ল কি না?'

'ইয়েস স্যার।'

'আমি চিফ মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর কি না?'

'ইয়েস স্যার।'

'আমার মুখের কথাই আইন কি না?'

'ইয়েস স্যার।'

'তাহলে শোনো, এই ব্ল্যাক বিউটি, কী যেন নাম, শামীম, এর স্বামীকে প্রমোশন দিয়ে পিন্ডি নিয়ে এসো। এখানে এসপি-গিরি করে সে পচতে পারে না। পিন্ডিতে হিউমিডিটি কম। ওখানে কেউ পচে না। এসো সুন্দরী। তুমি নাচ কেমন পারো?'

ইয়াহিয়া ব্ল্যাক বিউটির কোমর জড়িয়ে ধরেন। তাঁর মনে হয়, তিনি এক বেদেনির কোমর ধরেছেন। তাঁর নিশ্বাসে তিনি পান সাপের হিসহিস।

পূর্ব পাকিস্তানের উপ-সামরিক আইন প্রশাসক খাদিম হোসেন রাজার কাছে তাঁর সহকর্মীরা বলতে লাগল, 'বিগ কককে বাদ দিয়ে এ আমরা কাকে আনলাম?'

'বিগ কক কে?'

'আপনি কেন স্যার এই প্রশ্ন করছেন। আপনি ভালো করেই জানেন বিগ কক হলেন আইয়ুব খান।'

রাজা জবাব দিলেন, 'কেন, কী হয়েছে?'

'এয়ারপোর্টে প্রেসিডেন্ট নামেন। সোজা চলে যান প্রেসিডেন্ট হাউসে। সঙ্গে থাকেন গভর্নর আর সামরিক আইন প্রশাসক। তাঁরা দুজন সেখান থেকে বিদায় হওয়ামাত্রই প্রস্টিটিউটরা এসে ভিড় করে। ঢাকার মেয়েমানুষ তো আছেই, পশ্চিম পাকিস্তান থেকেও মেয়ে আনা হয়। প্রেসিডেন্টকে খুশি

করার জন্য তাঁর অনুগ্রহপ্রার্থীরা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নারীদের উড়িয়ে আনে অ্যারোপ্লেনে। সারা দিন সারা রাত তো এই চলে।'

'বাজে বকো না। আর মহিলাদের সম্পর্কে বলার সময় শ্রদ্ধা নিয়ে কথা বলবে।'

'প্রস্টিটিউট বলব না, স্যার?'

'না। বলবে না। তাঁরা আর্টিস্ট। তাঁরা আর্ট-কালচার করতে আসেন। আগের কক ছিল ওল্ড। নিউ কক নিডস নিউ চিকস।'

'স্যার, প্রেসিডেন্টের একসঙ্গে কটা মুরগি লাগে?'

'আরে। একটা মোরগের ডেরায় কয়টা মুরগি থাকে, তোমরা দেখো না। নিউ কক নিডস মেনি চিকস।'

'স্যার। আপনি কি কক মানে মোরগই বলছেন?'

'আমি কি চিকস মানে মুরগির বাচ্চাই বলছি?'

মেজর জেনারেল রাজা তাঁর গোয়েন্দাদের ডাকলেন। 'আচ্ছা বলো তো, প্রেসিডেন্ট হাউসে নারীরা গমন করেন, এটা কি ঠিক?'

গোয়েন্দারা মাথা চুলকান।

'মাথা চুলকাচ্ছ কেন? ভালো করে সাবান দিয়ে মাথা ধোবে। বলো। এটা তো সিকিউরিটি কনসার্ন। বলো।'

'জি স্যার, যায়। বাঙালি নারীরা যায়, পাঞ্জাবি নারীরা যায়।'

'তারা কী করে?'

'স্যার, সেটা দেখাটা কি আমাদের জন্য সংগত হবে?'

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে জেনারেল খাদিম হোসেন রাজার একাকী দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি কখনো। তবে ঢাকা গ্যারিসনে একদিন প্রেসিডেন্টকে তিনি পথ দেখিয়ে নিচ্ছিলেন ডাইনিং হলের। তাঁরা যাচ্ছেন নৈশভোজে। ইয়াহিয়া খাদিম রাজার দিকে ঘুরে বললেন, 'তোমার কমান্ডের জন্য আমি প্রেসিডেন্ট হিসেবে কি কিছু করতে পারি?'

রাজা একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, 'মুশকিলেন মাঝ পার পারিন ইতনি কে আসান হো গেয়ি।' এত মুশকিলের ভেতর আছি যে অভ্যাস হয়ে গেছে।

ইয়াহিয়া হো হো করে হেসে উঠলেন।

রাজার ভালো লাগল। তাঁদের প্রেসিডেন্টের রসবোধ প্রবল। এই প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একা একা কথা বলতে পারলে ভালোই লাগত। তাঁকে কিছু সৎ পরামর্শও দেওয়া যেত।

কিন্তু রাজা এত সৌভাগ্যবান নন যে প্রেসিডেন্টের দেখা পাবেন।

ঢাকায় এলে প্রেসিডেন্ট সরাসরি তাঁর প্রাসাদে চলে যান। এমনকি প্রদেশের গভর্নর অ্যাডমিরাল আহসান, ইস্টার্ন কমান্ড প্রধান জেনারেল ইয়াকুব খান—তাঁরাও রাজাকে বলেন, প্রেসিডেন্টকে তো পাওয়াই যায় না। তাঁদেরও একই কথা। প্রেসিডেন্ট এসে ঢোকেন তাঁর প্রমোদখানায়। তাঁকে ঘিরে ধরে রাখে কোটারিরা। শুধু চলে ফুর্তি আর ফুর্তি। অনেক পরে রাজা বই লিখবেন, তাতে তিনি বলবেন, ঢাকায় প্রেসিডেন্ট যে কদিন থাকতেন, তখন তাঁর প্রাসাদে যা যা ঘটত, সেসব মুদ্রণযোগ্য নয়।

শাহেরজাদি বলল, 'মহান বাদশাহ, মিলিটারি অফিসার বই লেখার সময় যা যা বলতে পারছেন না, আপনাকে বলার সময় আমি তা তা বলতে পারব তো?'

সুলতান শাহরিয়ার বললেন, 'অবশ্যই বলতে পারবে। আলিফ লায়লার গল্প, পারস্য উপন্যাস—চিরকালই ছিল অনলি ফর অ্যাডাল্টস। তোমার এই কাহিনি প্রাপ্তবয়স্করা ছাড়া আর কেউ ভবিষ্যতেও পড়বে না।'

ঢাকা থেকেই যেন ইয়াহিয়া একজন পাক্কা রাজনীতিবিদ হয়ে ফিরে আসেন। তিনি আর তাঁর উর্দি পরতে পছন্দ করেন না। তার বদলে তিনি পছন্দ করেন স্যুট, নেকটাই, সিল্কের শার্ট।

ইয়াহিয়া বললেন, 'ম্যাডাম নুরজাহান। আপনি কি শরাব নেবেন না?'

নুরজাহান সংকোচের সঙ্গে বললেন, 'আপনার সম্মানে একটুখানি নেব। দিনের বেলা তো!'

'আচ্ছা, তাহলে রাত্রেই আপনার সম্মানে আমি পার্টি দেব।'

রাতেই পার্টি দিয়েছিলেন ইয়াহিয়া। একটা হোটেলে বলরুমে। মদে ভেসে যাচ্ছিল ফ্লোর। নারী অতিথিদের কোমর ধরে দুলে দুলে নাচছিল পুরুষেরা। গান চলছিল। নাচ হচ্ছিল। পেশাদার নর্তকীরাও নাচছিল উদ্দাম। মাতাল ইয়াহিয়া ভুলে যাচ্ছিলেন যে তিনি একজন প্রেসিডেন্ট।

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'নুরি, তুমি শরাব মুখে নাও। আমি তোমার মুখের শরাব নিজের মুখে নিয়ে পান করব।'

'সে কী হুজুর!'

'আমাকে হুজুর হুজুর বলো না। বলবে, আগা।'

'সে কি, আগা হুজুর।'

'তোমার কণ্ঠ থেকে মধু ঝরে। তোমার মুখের শরাব আমি যদি পান করি, তাহলে আমার কণ্ঠস্বরও হবে মধুর মতো।'

আহ্লাদে গলে গিয়ে নুরজাহান ইয়াহিয়ার গলা জড়িয়ে ধরে ঝুলে পড়লেন। বললেন, 'আগা হুজুর, আপনার কণ্ঠস্বর এই দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে সেক্সি। আপনি কেন কণ্ঠে মধু ঝরাবেন। আপনার কণ্ঠস্বর মেঘের গর্জনের মতো। আমি যখনই আপনার এই কণ্ঠ শুনি, তখনই আমি গলে যাই।'

শাহেরজাদি বলল, 'ইয়াহিয়ার প্রেমে আরও একজন পড়েছিলেন।'

বাদশাহ বললেন, 'কে সে?'

'তার নাম নিক্সন।'

'পুরুষ না নারী?'

'পুরুষ।'

'তুমি কী বোঝাতে চাইছ?'

'আপনি যা বুঝতে চাইছেন, তা নয়।'

'তাহলে তুমি এটাকে প্রেম বলছ কেন?'

'কারণ, প্রেম ব্যাখ্যার অতীত। কার যে কাকে ভালো লেগে যায়, কে বলতে পারে, তাই না? আপনি কি এই ধাঁধাটা জানেন?' শাহেরজাদি রহস্য করে বলল।

বাদশাহ বললেন, 'কোনটা?'

'তুমি থাকো খালে-বিলে আমি থাকি ডালে,
দেখা হবে একসাথে মরণের কালে।'

'না, এই ধাঁধা আমি আগে শুনিনি।' সুলতান বললেন।

'বলুন, এর মানে কী?' শেহেরজাদি বলল।

'জানি না।' সুলতান মাথা নাড়লেন।

'এর মানে হলো, মাছ ও মরিচ। মাছ থাকে খালে-বিলে। মরিচ থাকে গাছের ডালে। দুজনের দেখা হয় মরণের কালে।'

'আচ্ছা। কিন্তু তুমি এটা কেন বলছ?' সুলতানের চোখে প্রশ্ন।

'কারণ, একজন নারী একজন পুরুষ কে যে কোথায় থাকে, কোন খালে, কোন ডালে। তারপর তাদের একদিন দেখা হয়। তাদের মধ্যে প্রেম হয়ে যায়। কেন পৃথিবীতে এত এত হৃদয় থাকতে দুটো হৃদয় পরস্পরের জন্য আকুল হয়, আমরা কি কেউ তা জানি? আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সাথে ইয়াহিয়ার ব্যাপারটাও তেমনি ব্যাখ্যার অতীত। আমি তাঁদের গে বলছি না। এটা নিতান্তই অযৌন একটা সম্পর্ক। কিন্তু ইয়াহিয়ার জন্য নিক্সনের টানটা ছিল সকল ব্যাখ্যারই অতীত। এবং এর সঙ্গে মিশে আছে তীব্র ইন্দিরা-বিরোধিতা। নিক্সন "কুত্তী", "বেশ্যা" ছাড়া ডাকতেনই না ইন্দিরাকে। তাঁর ঘৃণাটা ছিল প্যাথলজিক্যাল।'

'ইন্দিরা গান্ধীকে ঘৃণা করতেন, ইয়াহিয়াকে ভালোবাসতেন, ব্যাপারটা একটু সন্দেহজনক নয়?'

'না। সন্দেহ করবেন না। এটা নিতান্তই একটা বন্ধুত্ব। একটা তীব্র ভালো লাগা। আর তা এক দিনে ঘটেনি। ঘটেছে বছরের পর বছর ধরে। এই পছন্দ-অপছন্দের পেছনে ইতিহাস আছে, কার্যকারণ আছে। কাজেই সন্দেহ করবেন না।'

'আচ্ছা, সন্দেহ করছি না।'

নিক্সন ভারতে প্রথম গিয়েছিলেন ১৬ বছর আগে, ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বরে। ভারতে গিয়ে তিনি বিড়বিড় করে উঠলেন, 'হায় ঈশ্বর, দক্ষিণ এশিয়া স্রেফ অবিশ্বাস্য, যেখানেই যাও শুধু দারিদ্র্য, কোনো আশা নাই। তখন নিক্সন ছিলেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট। আইসেন হাওয়ার ছিলেন প্রেসিডেন্ট। নিক্সন ভারতে গিয়ে অপছন্দ করলেন নেহরুকে। নেহরুর মৃদুভাবে উচ্চারিত ব্রিটিশ ইংরেজি তাঁর কাছে ছিল অসহ্য। তাঁর কাছে নেহরুকে মনে হয়েছিল উদ্ধত, সিরিশ কাগজের মতো খসখসে, তাঁর অধিকারবোধ শ্বাসরোধী।'

তাঁর দম তাই বন্ধ হয়ে আসছিল ভারতে। সেখান থেকে তিনি গেলেন পাকিস্তানে। ওয়াশিংটনে ফিরে গিয়ে তিনি বললেন, 'পাকিস্তান হচ্ছে সেই দেশ, যার জন্য আমি যেকোনো কিছু করতে রাজি আছি। পাকিস্তানিরা কমিউনিস্ট-বিরোধী, আমেরিকানপন্থী। ভারতীয়দের চাইতে তাদের মনের মধ্যে জটিলতা কম। পাকিস্তানিরা সম্পূর্ণভাবে খোলামেলা, এমনকি যখন সেটা কাউকে আঘাতও করে।' ভিড়াক্রান্ত রাস্তাঘাটের চেয়ে অবশ্য পাকিস্তানের ঝকঝকে, তকতকে সেনানিবাসগুলোই তাঁর বেশি পছন্দ হলো। তাঁর পছন্দ হলো পাকিস্তানের ভোঁতা জেনারেলদের। সবচেয়ে পছন্দ হলো আইয়ুব খানকে। পাঁচ বছর পরে আইয়ুব খান পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হবেন। নিক্সনকে আইয়ুব খান বলেছিলেন, 'আমেরিকার বন্ধু হওয়া বিপজ্জনক, কারণ আমেরিকার প্রেম বড় অস্থির। এই কথা নিক্সনকে সারা জীবন তাড়া করে ফিরবে।'

এরপর নিক্সন ১৯৬৭ সালে গিয়েছিলেন দিল্লিতে। দেখা হয়েছিল নেহরুর মেয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে। তখন নিক্সন ক্ষমতার বাইরে, ক্ষমতায় যাব যাব করছেন। মাত্র কুড়ি মিনিট কথা হয়েছিল ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে। ইন্দিরা গান্ধীকে স্পষ্টতই দেখাচ্ছিল বিরক্ত। কুড়ি মিনিটের মাথায় ইন্দিরা গান্ধী হিন্দিতে বললেন, 'এই মিটিং আর কতক্ষণ চলবে?'

নিক্সন হিন্দি বোঝেন না, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর মুখের বিরক্তিরেখা ঠিকই পড়তে পারলেন।

তিনি পরে বলবেন, 'ইন্দিরা গান্ধীর বাবা মেয়ের মতোই খারাপ ছিল।' বা উল্টো করে বলা যায়, ইন্দিরা গান্ধী তাঁর বাবার মতোই খারাপ।

উল্টো দিকে, নিক্সন যখন ক্ষমতায় ছিলেন না, তখনো পাকিস্তান তাঁর

সঙ্গে মধুর ব্যবহার করত, এটা তিনি সব সময় মনে রেখেছেন।

আমেরিকানরা অকারণেই ভারতের সবকিছু ভালো দেখে, আর পাকিস্তানের সবকিছু খারাপ দেখে—আমেরিকানদের সমস্যা আছে, এই ছিল নিক্সনের অভিযোগ। আর এইটা বেশি করে ডেমেক্র্যাটরা। তিনি বুশের সঙ্গে একমত হয়েছিলেন যে, কেনেডি ভারতে বেশি সময় কাটিয়েছেন, তার কারণ ভারত সম্পর্কে প্রচলিত সাধু-গুরু-জাদুকর-সন্ন্যাসীর ধারণা। আমেরিকায় হিপ্পি কালচার জনপ্রিয়, সেখান থেকে তাঁদের ভারতপ্রীতির জন্ম—এরকম ধারণা পোষণ করতেন নিক্সন ও বুশ।

এবার নিক্সন প্রেসিডেন্ট হিসেবে সফর করতে গেলেন দিল্লি। তাঁর এয়ারফোর্স ওয়ান বিমানটি দিল্লি বিমানবন্দরের মাটি স্পর্শ করল। কিন্তু কোথায় সেই উচ্ছ্বাস? দশ বছর আগে প্রেসিডেন্ট আইসেন হাওয়ারকে যে উষ্ণ, বিপুল, বিশাল অভ্যর্থনা দেওয়া হয়েছিল, তা যে এবার নেই, তা খুব খালি চোখেই দেখা যাচ্ছিল। রাস্তায় লোকসমাগম ছিল, কিন্তু প্রাণের ছোঁয়া ছিল না। এয়ারপোর্টে নিক্সন তাঁর স্পষ্ট বাগ্‌ভঙ্গিমায় বললেন, 'ভারতের সঙ্গে অন্য দেশগুলোর সম্পর্কে প্রভাব ফেলে এমন সব বিষয় নিয়ে কথা বলতে এসেছি। আমাদের লক্ষ্য আসলে শান্তির পথ খুঁজে বের করা।'

তখন দুপুর। তাঁরা চলে গেলেন রাষ্ট্রপতি ভবনে, ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিদায়ত উল্লাহর সঙ্গে দেখা করলেন। এরপর বৈঠক হলো প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে। আলাপের মূল বিষয় ভিয়েতনাম। সেই সংলাপে না ছিল উচ্ছ্বাস, না ছিল উষ্ণতা, না ছিল কোনো প্রাণ। খুবই কেজো আলোচনা, কাঠের মতো, রসহীন আখের ছোবড়ার মতো।

ইন্দিরা গান্ধীর জন্য সময়টা খারাপ যাচ্ছিল। কংগ্রেসের অন্তর্দলীয় কোন্দলের কারণে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়েছেন হিদায়াত উল্লাহ। নিক্সনের সঙ্গে আলাপে মোটেও তিনি মন দিচ্ছিলেন না।

ইন্দিরা গান্ধী এমন ভাব দেখাচ্ছিলেন যে একটা পুঁজিবাদের প্রতিভূ এসেছেন। তাঁর ভাব দেখে মনে হচ্ছিল শিক্ষা-দীক্ষায়, বংশ-গৌরবে তিনি নিক্সনের চেয়ে বড়। নিক্সনের গোপন নিরাপত্তাহীনতার বোধ উসকে ওঠে, তিনি অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন। ইন্দিরা গান্ধী তাঁর বুদ্ধিজীবী বন্ধুদের কাছ থেকে নিক্সন সম্পর্কে যেসব আজে-বাজে কথা শুনেছেন, তা মিথ্যা না-ও হতে পারে, তাই তিনি ভাবছেন—পরে কিসিঞ্জার এইভাবে ব্যাখ্যা

করবেন এই দুজনের সম্পর্ককে।

বিকেলে নিক্সন গেলেন মহাত্মা গান্ধীর সমাধিতে, চমৎকার একটা ভাষণ দিলেন আর রোপণ করলেন একটা গাছের চারা। রাতের বেলা হিদায়াত উল্লাহর দেওয়া নৈশভোজ ছিল, সেখানে আধঘণ্টার মতো হলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

পরের দিন সকালে প্রেসিডেন্ট নিক্সন উড়াল দিলেন লাহোরের উদ্দেশে।

লাহোর তখন গরমে সেদ্ধ হচ্ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিক্সন ও মিসেস নিক্সন পেলেন হৃদয়ের উষ্ণতা। দিল্লির ব্রাহ্মণদের নীরস আতিথেয়তার বদলে এখানে আছে সৈনিকদের মাথামোটা কিন্তু দিলখোলা অভ্যর্থনা। এয়ারপোর্টে সবাই ঘামছিল, নিক্সন এবং ইয়াহিয়া, সেখানে দুজনেই বললেন, তাঁরা এই দুই দেশের অতীত বন্ধুত্বের দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে চান। ব্রিটিশদের নির্মিত সুপরিসর শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত লাহোর গভর্নর হাউসে তাঁদের সময় কাটল আনন্দে, আন্তরিকতায়।

নিক্সনের মনে হলো, এই হলো সে-ই, যাকে আমি খুঁজছি। পুরুষের বন্ধু পুরুষ। এ কোনো নারী নয় যে দেশ চালায়। এই হলো বেটাছেলে যে আরেকজন বেটাছেলেকে বরণ করে নিতে জানে। পেশল শরীর। সবচেয়ে মজার হলো তার ভ্রু। শজারুর কাঁটার মতো তার ভ্রু চোখের ওপর থেকে বেরিয়ে আকাশ দেখতে চাইছে। চুলটাও কত মজার। কালো চুলের সামনে একটুখানি সাদা। ওই কুন্তী ইন্দিরাও একটুখানি সাদা চুল বের করে রাখে—গভর্নর হাউসের বাথরুমের কমোডে বসে নিক্সন ভাবলেন। তবে এই লোকটা, ইয়াহিয়া, নিজেকে সব সময় বলেন সৈনিক। তাঁর চুলের স্টাইলটা অন্য রকম। আর কথা বলেন কেমন গলার ভেতর থেকে শব্দ বের করে এনে। স্যান্ডহার্স্ট প্রডাক্ট।

ইয়াহিয়া যথারীতি তাঁর দিন শুরু করেছেন কনিয়াক দিয়ে। এটা তাঁর সকালবেলার পানীয়। পড়ন্ত দুপুরের গরমে সেদ্ধ হতে হতে তিনি বরণ করে নিলেন নিক্সনকে। গভর্নর হাউসের শীতল হাওয়া তাঁকে খানিকটা প্রশান্ত করল। কালো রঙের কোট, সাদা রঙের শার্ট, কালো রঙের টাই পরা ইয়াহিয়া। ছাই রঙের কোট, কালোর দিকেই রংটা যাবে, হালকা সাদা স্ট্রাইপ, সাদা শার্ট, চেক টাই পরা নিক্সনকে ইয়াহিয়ার তুলনায় একটু ছোটই লাগছে।

ইয়াহিয়া তখন ভাবছিলেন নুরজাহানকে। এই লাহোর গভর্নর হাউসের বিছানাটা বড়, আর গদির নিচে স্প্রিং দেওয়া, এইখানে নুরজাহানকে চিত করতে পারলে বিছানাটা কীভাবে দুলবে। তখন, পাশাপাশি সোফায় বসে—পেছনে ফায়ার প্লেস, সাদা দেয়ালে নিপুণ কারুকাজ—নিক্সন বললেন ইয়াহিয়াকে, 'আপনি একটা কাজ করে দিন। চীনের সঙ্গে আমরা সম্পর্ক উন্নয়ন করতে চাই। কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই। আপনি মধ্যস্থতা করুন। আমরা চীনকে জানিয়েছি। কিন্তু আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। আপনি যদি এই ব্যাপারে মধ্যস্থতা করেন, চীনের প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি বলেন, তাহলে ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য হবে এবং চীন বিষয়টাকে গুরুত্ব দিয়ে দেখবে।'

নুরজাহানের কথা ভুলে গেলেন ইয়াহিয়া। এই কাজটা তিনি করে দেবেন। ঠিক করলেন।

'এর বদলে আপনাকে ও আপনার দেশকে আমরা সাহায্য করব।'

হো হো হো করে হেসে উঠলেন ইয়াহিয়া। তাঁর হাতের হুইস্কির গেলাস ছলকে উঠল। তিনি বললেন, 'আমি পাকিস্তানি পাঠান। আমি সৈনিক। আমি বন্ধুকে যা দিই, তা দিই নিঃস্বার্থভাবে। এর বদলে আমি কিছু চাই না।'

আহা। কী বৈপরীত্য। ভারতীয়রা কী দিলাম কী পেলাম এই হিসাব কষে। আর এ বলে, কিছু চাই না। এ না হলে বেটাছেলে কিসের!

একটু আগে ইয়াহিয়া তাঁর লিখিত বক্তৃতা দিচ্ছিলেন চিবিয়ে চিবিয়ে। বলছিলেন চাঁদে আমেরিকান নভোচারীদের পা রাখার কথা। বলছিলেন দুই দেশের বন্ধুত্ব বাড়ানোর কথা।

জবাবে নিক্সন বলেছিলেন, 'আমি এবার নিয়ে পঞ্চমবারের মতো পাকিস্তান সফর করছি। আমি যখন এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, আমার মনে এর আগের সফরগুলোর কতগুলো ছবি রয়ে গেছে। প্রথম হলো, এই দেশের জনসাধারণের সাহসিকতা। এই দেশের মানুষের টিকে থাকার ক্ষমতা, এই দেশের মানুষের মহান আদর্শবাদিতা, ভবিষ্যতের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাস। আর এই দেশের মানুষের আতিথেয়তা। যা পৃথিবীর কোনো দেশের মানুষই পারবে না। আমি এর আগে দুবার এসেছিলাম ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে, দুবার এসেছিলাম সাধারণ নাগরিক হিসেবে, এবার

এসেছি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হিসেবে। কিন্তু আমি আপনাদের বলতে চাই, আমি কেবল একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে আসিনি, আমি এসেছি পাকিস্তানের একজন বন্ধু হিসেবে। আমাদের দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে কিছুদিন ধরে কিছু দাগ পড়েছে, কিন্তু আমি সেটা দূর করতে এসেছি।'

ভাষণ হলো। আলোচনাও হলো। এবার কী। ইয়াহিয়া হুইস্কির বোতল খালি করতে থাকেন।

তাঁর চিফ প্রটোকল অফিসার ওয়েটারকে বলে, 'এই হুইস্কির বোতল অর্ধেক করো। এর মধ্যে পানি মেশাও। আজকেও না হিজ এক্সেলেন্সি মাতলামো শুরু করে দেন।'

'স্যার, আমার কিছু বলার ছিল।' বললেন অ্যাডমিরাল আহসান।

ভাইস অ্যাডমিরাল এস এম আহসান। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। সাদা পোশাকে দাড়িগোঁফ কামানো লোকটাকে মনে হয় নিপাটতম ভদ্রলোক। হায়দরাবাদে জন্ম, ব্রিটিশ রয়্যাল অ্যাকাডেমিতে নৌবাহিনীর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, পদার্থবিজ্ঞানের গ্রাজুয়েট। উর্দু-বলিয়ে পরিবারের ছেলে, ১৯৪৭-এ চলে এসেছেন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে।

ইয়াহিয়া তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। আহসানের ওপরের ঠোঁট কাঁপছে। এটা ভালো লক্ষণ নয়।

আজ সকালের কেবিনেট মিটিং শুরু হয়েছে দুপুরে। সকালবেলা ইয়াহিয়া ঘুম থেকে উঠতে পারেননি। সারা রাত পার্টি হয়েছে। বিছানা ছেড়ে তিনি কনিয়াক দিয়ে ব্রেকফাস্ট করেছেন। এখনো তাঁর হ্যাংওভার যায়নি। তবু তিনি কথা বলছেন জড়তা ছাড়াই, তাঁর ঠোঁট কাঁপছে না।

আহসানের ঠোঁট কাঁপছে কেন। তিনি কি গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলতে চান?

আহসান বললেন, 'শেখ মুজিব তো খুবই ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। জানুয়ারিতে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার পর তার বাড় আরও বেড়ে গেছে। তার ছয় দফা প্রবল জনপ্রিয়। আপনি আমি সবাই বুঝি ছয় দফা হলে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। অথচ সে ছয় দফা ছয় দফা করে সারা পূর্ব পাকিস্তানের লোকদের খেপিয়ে তুলেছে। তার জনসভায় লোক হয় প্রচুর। অন্যেরা জনসভাই করতে পারে না। এই অবস্থায় নির্বাচন দিলে শেখ মুজিব জয়লাভ করবে। সে বলতে শুরু করেছে, নির্বাচন হলো ছয় দফার মেমোরেন্ডাম। আমাদের স্যার একটা কিছু করা উচিত। মুজিবকে ছয় দফা প্রচার করতে দেওয়া উচিত নয়।'

জেনারেল ইয়াহিয়া মদালস কণ্ঠে বললেন, 'শেখ মুজিবের ছয় দফার প্রচারণা কি সামরিক বিধির ১৬ ধারার ব্যত্যয়? পীরজাদা, এদের বলে দাও, ১৬ বিধিতে কী বলা আছে?'

লেফটেন্যান্ট জেনারেল পীরজাদা, প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, বললেন, '১৬ বিধিতে বলা আছে, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কিছু বলা যাবে না।'

আহসান মাথা চুলকাতে শুরু করলেন। ভাগ্যিস তাঁর নৌবাহিনীর সাদা হ্যাটটা টেবিলে ছিল।

অন্য মন্ত্রীরা, প্রায় সবাই সশস্ত্র বাহিনীরই লোক, বললেন, 'তা মনে হয় না। এটা ১৬ বিধির লঙ্ঘন নয়।'

'তাহলে আর চিন্তা কী?' প্রেসিডেন্ট বললেন।

আহসান মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললেন, 'কিন্তু একবার নির্বাচিত হয়ে গেলে আপনি এই পাগলা ঘোড়া থামাবেন কী করে?'

'আরে, ও হলো খোদার ষাঁড়। ওকে ইচ্ছামতো ঘুরতে দাও। কিছু বলো না। আচ্ছা, আমি একটা লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার দিয়ে দিই। নির্বাচন হবে কিসের শর্তে। সংবিধান রচিত হবে কোন শর্তে।'

'তাহলে খুব ভালো হয়।'

বিকেল হয়ে এল। প্রেসিডেন্ট হুইস্কির বোতল খুললেন। পীরজাদা আগে চিফ অ্যাডজুট্যান্ট ছিলেন। আইনকানুন তিনি ভালো বোঝেন। তাঁর সঙ্গে লাগিয়ে দিলেন ড. জি কিউ চৌধুরীকে, বাঙালি মন্ত্রী, আইনকানুনের মুসাবিদা যে ভালো পারে।

হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিয়ে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'দুইটা শর্ত থাকবে। ভোট তো ওরা যেমন চায় তেমনভাবেই হবে। এক মাথা এক ভোট। পূর্ব পাকিস্তান এক ইউনিট পশ্চিম পাকিস্তান এক ইউনিট থাকবে না। পশ্চিমের প্রদেশগুলো পুনরুজ্জীবিত হবে। পূর্ব পাকিস্তানে আসন বেশি থাকবে, কারণ ওদের জনসংখ্যা বেশি। সব ঠিক আছে। শুধু দুটো জিনিস ঠিক রাখতে হবে। এক. রাষ্ট্রের অখণ্ডতা। দুই. রাষ্ট্রের ইসলামি চরিত্র।' তিনি গেলাসে আরেকটু হুইস্কি ঢেলে নিলেন।

তাঁর কত ব্যস্ততা। নুরজাহান আসেন। আকলিম আসেন। আর আসেন তারানা। আহ। তারানা!

তারানার একটা সিনেমা ইয়াহিয়া দেখেছিলেন।

তাঁর দোহারা শরীর। তলপেটে তিনটা ভাঁজ। ইয়াহিয়ার আবার একটু মোটাসোটা শরীরই পছন্দ। আটার ময়ান যেমন ছানা যায়, মাখা ময়দার মতো শরীরও তেমনি ছানা যায়।

তারানা সিনেমায় ভ্যাম্প চরিত্রে অভিনয় করেছেন। খোলামেলা পোশাক। বাইজি বেশে নাচছিলেন। শরীরটা কাত করে কোমর দোলাচ্ছিলেন। নিতম্ব দোলাচ্ছিলেন। বুক নাড়ছিলেন। গিরিখাদ কেঁপে কেঁপে উঠছিল। সেই সিনেমা দেখেই ইয়াহিয়ার শরীরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। একে আমার চাই-ই।

আন্তরিকভাবে চাইলে পাওয়া যায় না, এমন জিনিস দুনিয়ায় কী আছে!

দুদিন পরই তাঁর সান্ধ্য পার্টিতে তারানা এসে হাজির।

'তুমি? তারানা না?'

'জি জনাব।'

'আমি তোমাকে স্বপ্নে দেখেছি।'

তারানার কামিজের গলা যথেষ্টই বড়। তাঁর বুকের প্রায় পুরোটাই বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু আশ্চর্য যে বোঁটা দেখা যাচ্ছে না। ব্যাপারটা রহস্যজনক।

'আশা করি স্বপ্নটা যথেষ্টই দুষ্টু ছিল,' মিচকি হাসি দিয়ে তারানা বললেন।

'এই দুষ্টু মেয়ে?'

'জনাব, আপনি আমাকে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখেন। আর আমি

আপনাকে দেখি সর্বক্ষণ। জেগে জেগে। আপনার এই ভুরুর কোনো তুলনা নেই। আপনার ভুরুর চুল এই রকম। আর আপনার ভেতরটা না জানি কী রকম।'

'চলো, তুমি আমার সঙ্গে বাথরুমে চলো।'

এখন লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ঠিক হচ্ছে। এটা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তিনি সময় করে হাজির হলেন টেলিভিশনের সামনে। রেডিওর মাইক্রোফোনও তাঁর সামনে। তিনি ঘোষণা করলেন, 'আই উড নট অ্যাক্সেপ্ট অ্যানিথিং দ্যাট কাটস অ্যাক্রস দ্য বেসিক প্রিন্সিপালস অব আওয়ার নেশনহুড।'

পরের দিনই লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার (এলএফও) ঘোষিত হলো।

শেখ মুজিবুর রহমান লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক মন দিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে সেটা প্রত্যাখ্যান করে বিবৃতি দিলেন তিনি। ফাজলামো নাকি। বলা হচ্ছে, নির্বাচিত অ্যাসেম্বলি যে সংবিধান বানাবে, তা প্রেসিডেন্ট অনুমোদন দিলেই কেবল পাস হবে। তা না হলে নয়। এইটা বাংলাদেশের মানুষ মেনে নেবে?

ইয়াহিয়া ঠিক করলেন তিনি ঢাকা যাবেন।

সঙ্গে নিয়ে যাবেন তারানাকে।

তারানা। আহ তারানা!

তবে তিনি এক ঢিলে দুই পাখি মারবেন। পাখি মারা তাঁর প্রিয় শখ। তিনি প্রায়ই লারকানা যান। সেখানে পাখি শিকার করেন। তাঁর পিন্ডির প্রেসিডেন্ট হাউসেও অনেক পাখি।

তিনি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিয়ে যাবেন তারানাকে। ঢাকায় পাবেন শামীমকে। আরও আরও নারীরা এসে তাঁর হাঁটুর কাছে বসে থাকবে। জেনারেলরা তাঁদের বান্ধবী, শালি, খালাতো বোনদের নিয়ে আসবেন। ব্যবসায়ীরা আনবেন অভিনেত্রী-গায়িকাদের।

কিন্তু তাঁর দুই পাখির একটা পাখির নাম শেখ মুজিব।

শেখ মুজিব এলএফও মানতে চাইছেন না। এটা মানাতে তাঁকে পটাতে হবে। পাখি শুধু বন্দুক দিয়ে শিকার করা যায় না, পাখি দিয়ে পাখি ধরা যায়। দানা দিয়ে পাখি বশও করা যায়।

১৯৭০ সালের ৪ এপ্রিল।

ঢাকার প্রেসিডেন্ট হাউস। আগের রাতের পার্টি শেষে যা কিছু পড়ে ছিল, বোতল, কাগজের টুকরা, খাবারের কণা, পানি, মদের ছিটা, এবং বিস্রস্ত নারীদের এলোমেলো সংলাপ, সবকিছু ধুয়ে-মুছে সাফসুতরো করা হয়েছে।

ইয়াহিয়া ডেকেছেন শেখ মুজিবকে। বলেছেন, বন্ধুত্বপূর্ণ আড্ডা হবে।

চৈত্রের বিকেলে মুজিব এলেন। সাদা পাঞ্জাবি, সাদা পায়জামা, তার ওপরে হাতাছাড়া কালো রঙের কোট। হাতে তামাকের পাইপ। তিনি শুকিয়ে গেছেন আরও। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি অবিরাম কাজ করছেন তাঁর পার্টি গড়ে তুলতে। পার্টির সম্মেলন করেছেন সারা দেশে। সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকীর আলোচনায় ঘোষণা করেছেন, 'এখন থেকে পূর্ব পাকিস্তান বলতে কিছু থাকবে না। এই অঞ্চলের নাম বাংলাদেশ। ওরা বাংলা শব্দটা মুছে দিতে চায়। এক বঙ্গোপসাগর ছাড়া সরকারি কোনো কাগজে বঙ্গ শব্দটাই নাই। এটা আমরা মানি না। আজ থেকে এই দেশ বাংলাদেশ।'

বছরের শুরুতে সার্জেন্ট জহুরুল হকের শাহাদাত দিবস পালন করা হয়েছে সমস্ত প্রদেশে। তাঁর বড় বড় ছবি দিয়ে ভরে ফেলা হয়েছিল সমস্ত ঢাকা শহর। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হিসেবে মুজিবের সঙ্গে একই স্থানে বন্দী ছিলেন তিনি। তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল এক বছর আগে। তাঁর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সমস্ত পূর্ব বাংলা যেন মিছিলের দেশে পরিণত হয়েছিল। রাজশাহীর অধ্যাপক জোহা হত্যার প্রতিবাদেও একই ঘটনা ঘটে। সারা বাংলা অগ্নিগিরির মতো জ্বলন্ত লাভা ছড়াতে থাকে। গণ-অভ্যুত্থানের মুখে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেন আইয়ুব খান। মুজিবকে মুক্ত করে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় পশ্চিম পাকিস্তানের গোলটেবিল বৈঠকে। তারপর ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসেছেন। তাঁরও বার্ষিকী পালিত হলো। এদিকে বাংলায় একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবসে বাংলা বাংলা বলে রব তুলে ফেলেছে বাঙালিরা। এই প্রদেশের কোথাও উর্দু কিংবা ইংরেজি সাইনবোর্ডও নাই।

ইয়াহিয়া ক্ষমতা নেবার আগেই মুজিবের সঙ্গে কথা বলে নিয়েছিলেন। মুজিবের একটাই কথা, এক মাথা এক ভোটের ভিত্তিতে ভোট দিতে হবে।

আর আসনসংখ্যা নির্ধারিত হবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে। মুজিবের ধারণা, নির্বাচন হলেই তিনি জিতবেন। আর ইয়াহিয়ার গোয়েন্দারা বলছেন, না, ভোট ভাগ হয়ে যাবে। ঝুলন্ত পার্লামেন্ট হবে। রাজনৈতিক নেতারা কামড়াকামড়ি করবে। সেনাবাহিনীই ক্ষমতা ধরে রাখতে পারবে।

কাজেই ইয়াহিয়া ধীরে ধীরে এগোতে চান। অক্টোবরে ভোট হবে। এখন সবে এপ্রিল। ছয় মাস হাতে আছে। এক শ আশি দিন। ৩৬০ বোতল হুইস্কি তিনি সাবাড় করতে পারবেন। ৩৬০টা রমণীকে তিনি বগলদাবা করে রাখতে পারবেন। তারপর হবে কামড়াকামড়ি। তিনি প্রেসিডেন্ট থেকেই যাবেন। আমেরিকা যার সঙ্গে আছে, তাকে কে পারবে গদি থেকে সরাতে।

ইয়াহিয়াও ফুরফুরে মেজাজেই আছেন। শেখ মুজিবের জন্য তিনি উষ্ণতম অভ্যর্থনার আয়োজন করলেন। তাঁকে জড়িয়ে ধরে এগিয়ে নিয়ে গেলেন বসবার ঘরে।

ইয়াহিয়া বললেন, 'আপনাকে রোগা দেখাচ্ছে। বেশি করে খান।'

শেখ মুজিব বললেন, 'আপনি মোটা বলেই তো আমি শুকনো। আবার আমি শুকনো বলেই আপনি মোটা।'

ইয়াহিয়া বললেন, 'মুজিব, আপনি এলএফও নিয়ে বেশি চিন্তিত।'

'দেখেন, পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগই একমাত্র জনপ্রিয় দল। সারা দেশের মানুষ আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত। তারা সবাই ছয় দফার পক্ষে।'

'আপনার ছয় দফা পাকিস্তানের ঐক্যের পক্ষে নয়। তার পরেও কি আমি সামরিক বিধির ১৬ প্রয়োগ করেছি? এটা আপনাকে প্রচার করতে দিচ্ছি না?'

'আমার ছয় দফা পাকিস্তানকে শক্তিশালী করবে। উভয় পা শক্তিশালী না হলে এক পা দিয়ে একটা দেশ দৌড়াতে পারে না। শুনুন, স্যার, প্রেসিডেন্ট, চট্টগ্রামের ডিসি শিয়ালকোটে চিঠি লিখেছেন। তাঁর পাখা টানার জন্য একজন লোক দরকার। তাকেও তিনি আনাবেন শিয়ালকোট থেকে। আমরা বাঙালিরা কি পাখাও টানতে পারি না? বাংলা যদি এতই দুর্বল হয়, তাহলে পাকিস্তান শক্তিশালী হয় না।'

'দেখুন, এলএফও একটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। আমি প্রেসিডেন্ট

থাকছি। কাজেই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা যে সংবিধান তৈরি করবেন, তা আমি মেনে নেব। এ নিয়ে আপনি একদমই চিন্তা করবেন না।'

'দেখুন। আমার কথা শুনতে হবে। আমি যদি আপনার নির্বাচন বর্জন করি, অবস্থাটা কী হবে বুঝতে পারছেন?'

'আমি আপনার মূল দাবি তো মেনে নিচ্ছি। নির্বাচন হবে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে। আর পশ্চিম পাকিস্তান এক ইউনিট থাকবে না। আর অবশ্যই পূর্ব পাকিস্তানের আসনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের সবগুলো প্রদেশের আসনসংখ্যার চেয়ে বেশি হবে।'

'ঠিক আছে। আপনি নির্বাচন দিন। আমি আপনাকে সহযোগিতা করব। আপনি কাইন্ডলি একটা প্রেস রিলিজ দিন। তাতে বলুন, আমাদের মধ্যে মতৈক্য হয়েছে, নির্বাচনের পর এলএফওর ২৫ ও ২৭ ধারা আপনি কার্যকর করবেন না। প্রেস রিলিজের কোনো লিগ্যাল পাওয়ার নাই। কিন্তু আপনি মুখে যা বলছেন, আমি তা সত্য জ্ঞান করে মেনে নিচ্ছি। প্রেস রিলিজ দিন। আমার পার্টির লোকদের তা মানাতে সুবিধা হবে।'

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা সাদিক মালিককে এক ঘণ্টা আগে ছুটি দেওয়া হয়েছে। সাদিক মালিক এখন তাঁর এক বন্ধুর বাড়িতে। এক কাপ চা মুখে দিয়ে তিনি কেবল চায়ের এবং এই চায়ের পেছনের মানুষদের প্রশংসা করতে উদ্যত হয়েছেন। এমন সময় তাঁর ওয়্যারলেস বেজে উঠল। এখনই আসতে হবে প্রেসিডেন্ট হাউসে। তিনি চা অসমাপ্ত রেখে ছুটলেন।

তাঁকে বলা হলো, 'একটা প্রেস বিজ্ঞপ্তি লেখো। বলো যে, প্রেসিডেন্ট এলএফওর ২৫ ও ২৭ ধারা রদ করছেন।'

সাদিক তা-ই করলেন। তিনি সুন্দর করে রচনা করলেন প্রেস বিজ্ঞপ্তি। কিন্তু এরই মধ্যে প্রেসিডেন্টের মন বদলেছে। তাঁর সামরিক উপদেষ্টারা বললেন, 'বাস্টার্ড পলিটিশিয়ানদের হাতে সব অস্ত্র তুলে দেবেন কেন?'

তিনি বললেন, 'তাই তো। তাহলে কী করব?'

'মুজিব তো খুশিমনেই বিদায় নিয়েছে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেবার দরকার নাই।'

তারানাকে বগলদাবা করে তিনি ফিরে যাচ্ছেন পিন্ডিতে। ইয়াহিয়া খান আছেন খোশ মেজাজে।

তারানা আগেভাগেই প্লেনে উঠে বসে আছেন।

সাংবাদিকদের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য তিনি বোরকাও পরে নিয়েছিলেন তেজগাঁও বিমানবন্দরে ঢোকার মুখে। সিনেমার অভিনেত্রী তিনি। লোকে তাঁকে সহজেই চিনে ফেলতে পারে।

সাংবাদিকেরা ঘিরে ধরলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে।

'আপনার সঙ্গে শেখ মুজিবের কী কথা হলো?'

'ঢাকার বসন্ত খুব সুন্দর। এই সব নিয়ে।'

'শেখ মুজিব কি এলএফও মেনে নিয়েছেন?'

'সেটা আপনারা শেখ মুজিবের মুখ থেকে শুনবেন।'

'আপনি কি এলএফওর ২৫ ও ২৭ ধারা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। শেখ মুজিবুর রহমান তা-ই বলছেন।'

'দেখুন, ওটা একটা আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। সব গণতান্ত্রিক দেশেই সংসদে পাস করা আইন প্রেসিডেন্টের সম্মতি ও স্বাক্ষরের জন্য পেশ করা হয়। প্রেসিডেন্ট সেটাকে সই করে দেন। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পাস করা সংবিধান আমি মেনেই নেব।'

আওয়ামী লীগের সমর্থক একজন সাংবাদিক বললেন, 'ইংল্যান্ডের রানি যেমন পার্লামেন্টে পাস করা বিলে সই করেন। সেরকম কি?'

'ঠিক বলেছেন।'

শেখ মুজিব নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। পূর্ব পাকিস্তানে জনসভার পর জনসভায় যাচ্ছেন তিনি। তিনি ঠিক করেছেন, পাকিস্তানেও যাবেন। ভোট চাইবেন।

তাঁর জনসভা উপচে পড়তে লাগল মানুষে। লাখ লাখ মানুষ সমবেত হতে লাগল তাঁর ডাকে। সারা দেশে রব উঠে গেল, 'তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব। জাগো জাগো, বাঙালি জাগো।'

শেখ মুজিব একটা জনসভায় যোগ দিতে যাচ্ছেন গাড়ি করে। প্রচণ্ড গরম। তার মধ্যে বাতাসে জলকণা। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা এক সাংবাদিক উঠেছেন তাঁর গাড়িতে। অবাঙালি এই সাংবাদিক মুজিবকে বললেন, 'ব্যাপার কী বলুন তো। আপনি যা বলেন, ইয়াহিয়া তা-ই মেনে নেয়। ঘটনা কী?'

সাংবাদিকটি তাঁর ক্যাসেট রেকর্ডার গোপনে অন করলেন।

শেখ মুজিব বললেন, 'আইয়ুব খান যেভাবেই হোক না কেন আমাকে জনপ্রিয়তার এমন শিখরে পৌঁছে দিয়েছে যে এখন এমন কেউ নাই যে আমাকে না বলতে পারে। আমি যা চাইব তা-ই করতে হবে। এমনকি ইয়াহিয়ারও সাধ্য নাই আমার কথার বাইরে যাওয়ার।'

এই পশ্চিম পাকিস্তানি সাংবাদিকটি এই রেকর্ড পৌঁছে দিলেন পাকিস্তানি শাসকদের হাতে।

এদিকে শেখ মুজিব তাঁর পার্টির নেতাদের সঙ্গে বসলেন এলএফওর বিষয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কী আলোচনা হয়েছে, তা বিবৃত করার জন্য।

সেখানে পাকিস্তানি গোয়েন্দারা ক্যাসেট রেকর্ডার বসিয়ে রেখেছেন।

একজন নেতা জিগ্যেস করলেন, 'প্রেসিডেন্ট কী বললেন?'

'তিনি বলেছেন, তিনি এলএফওর ২৫ আর ২৭ ধারা প্রয়োগ করবেন না।'

'আপনি তাঁকে বিশ্বাস করেন?'

'তাঁর প্রেস রিলিজ দেবার কথা ছিল। তিনি দেননি। কিন্তু তাঁর মুখের কথা বিশ্বাস করা যায়। তবু তিনি কথা রাখবেন না এই প্রস্তুতিও আমাদের রাখতে হবে।'

'তিনি যেহেতু প্রেস রিলিজ দেননি, তাই ধরেই নেওয়া যাচ্ছে যে তিনি এলএফওর এই ধারা ৬ দফার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবেন।'

মুজিব টেবিল চাপড়ে বললেন, 'আমার লক্ষ্য বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। একবার নির্বাচন হয়ে যাক, আমি এই এলএফও ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে বাতাসে উড়িয়ে দেব। একবার নির্বাচন হয়ে গেলে কার সাধ্য আছে আমাকে চ্যালেঞ্জ করবে।'

ওই রেকর্ড নিয়ে যাওয়া হলো ইয়াহিয়ার কাছে। ইয়াহিয়ার ভ্রুর চুল একেবারে খাড়া হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'আমি জানি তাকে কীভাবে শায়েস্তা করতে হয়। সে যদি আমার সঙ্গে প্রতারণা করে, আমি তাকে উচিত শিক্ষা দেব।'

ঢাকার ভারপ্রাপ্ত মার্কিন কনসাল এন্ড্রু কিলগোর। ১৯৭০ সালের জুন মাসের এক প্রচণ্ড গরমের দিনে সকালবেলা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে এলেন কিলগোর।

শেখ মুজিবকে দেখাচ্ছিল দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। তিনি বললেন, 'সামনে নির্বাচন। আর সাড়ে তিন মাস বাকি ইলেকশনের। কিন্তু প্রশাসনের ভূমিকা খুবই পক্ষপাতদুষ্ট। সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দারা যাচ্ছে শিল্পপতিদের কাছে। তাদের বলছে, তারা যেন আওয়ামী লীগকে সমর্থন না দেয়। যদি সেনাবাহিনী, আমলাতন্ত্র ও কায়েমি স্বার্থবাদীরা এ ধরনের খেলা খেলতেই থাকে, তাহলে আমি স্বাধীনতা ঘোষণা করব। সেনাবাহিনী বাধা দিলে শুরু করব গেরিলাযুদ্ধ। কিন্তু তাহলে ভিয়েতনামের মতো অবস্থা হতে পারে, যেখানে কমিউনিস্টরা আধিপত্য বিস্তার করে আছে। শুধু এই চিন্তা থেকে আমি এখনো চুপ করে আছি।

'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় এলে আমি তাকে বলেছি, করাচির পাগরোর পীর এরই মধ্যে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে মুসলিম লীগে যোগ দিয়েছেন। কারণ, একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে আওয়ামী লীগ ছাড়তে বাধ্য করেছেন।'

কিলগোর মাথা নাড়তে লাগলেন। পাগরোর পীর সম্পর্কে তিনি জানেন। তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন মার্কিন কর্মকর্তা ডি এম কোচরান। পীর সাহেব শেখ মুজিবের সঙ্গে থাকতে চান। তিনি তাঁর অনুসারীদের বলেছেন, তিনি শুধু তাদের জন্যই দোয়া করবেন, যারা শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগকে সমর্থন করবে। তবে তিনি নিজে যোগ দেবেন না। কারণ, তিনি সুযোগ-সুবিধামতো যাতে ফিরে আসতে পারেন, সে সুযোগ তিনি খোলা রাখতে চান।

ঢাকাস্থ মার্কিন উপদূতাবাস এই বৈঠকের বিবরণ পাঠিয়ে দেয় ওয়াশিংটনে।

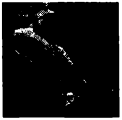

৫২ বছরের ইয়াহিয়ার কামনার আগুন সব সময়ই জ্বলতে থাকে। সারাক্ষণই প্রেসিডেন্ট হাউসে নারীরা আসছেন, যাচ্ছেন।

এঁদের মধ্যে আছেন তাঁর অধস্তন সামরিক কর্মকর্তা, জেনারেল-ব্রিগেডিয়ারদের স্ত্রীরা।

অনেক সময় কাজ বাগিয়ে নেওয়ার জন্য পতিতালয় থেকে মেয়ে ভাড়া করে এনে কোনো ব্যবসায়ী পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন ইয়াহিয়ার সঙ্গে, 'আমার খালাতো বোন, তুরস্কের রাষ্ট্রদূতের নিজের বোন।'

রাষ্ট্রদূতের বোনকে চেখে দেখতে ইয়াহিয়া আগ্রহী হন।

ব্যবসায়ী তাঁর কাজ পান।

তারানা একদিন অসময়ে, কোনো পাস ছাড়াই এসে হাজির প্রেসিডেন্ট ভবনে।

গার্ড তাঁকে আটকে দেয়।

তারানা বলেন, 'আমাকে ঢুকতে দাও। আমি চিত্রনায়িকা তারানা।'

'আপনি তারানা হতে পারেন, কিন্তু বৈধ অনুমতি ছাড়া আমি আপনাকে ঢুকতে দিতে পারি না।'

'তুমি জানো, আমি কে?'

'আমি জানি না। জানলেও আমি আপনাকে কাগজ ছাড়া ঢুকতে দিতে পারতাম না। আমার চাকরি চলে যাবে।'

'আচ্ছা, তুমি ভেতরে খবর দাও। প্রেসিডেন্টের এডিসিকে কল করো।'

গার্ড ফোন দেয় এডিসি সাহেবের নম্বরে। 'স্যার, একজন ম্যাডাম এসেছেন। আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'দাও।'

'হ্যালো, আমি তারানা...'

এডিসি বলেন, 'দিন, গার্ডকে দিন।'

গার্ড বলে, 'স্যার...'

'ওনাকে ঢুকতে দাও।'

তারানা ভেতরে ঢোকেন।

সোজা চলে যান ইয়াহিয়ার কাছে।

ইয়াহিয়া তখন রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত। তাঁর সামনে ফাইল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন পররাষ্ট্রসচিব। তাঁকে বোঝাচ্ছেন ইরান সফরের সময় করণীয় কী।

তারানা বলেন, 'আগাজি।'

সবাই চমকে ওঠেন।

ইয়াহিয়া সবার সামনে উঠেই তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন।

'আগাজি, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে। জরুরি।'

'বলো।'

'না। এখানে নয়। আড়ালে।'

তাঁরা ভেতরের ঘরে চলে যান।

'বলো তোমার গোপন কথা।'

'দেখো না, আকাশটা আজকে কত নীল। আমার বাগানে লাল রঙের দুটো গোলাপ ফুটেছে। আর তাতে দুটো বুলবুলি খেলা করছে। একজন আরেকজনের ঠোঁটে ঠোঁট দিয়ে আদর করছে। বলো, এমন দিনে কি না এসে পারা যায়।'

দুই ঘণ্টায় দুবার মিলিত হলেন তাঁরা। তারপর তারানা বেরিয়ে যাচ্ছেন একই গেট দিয়ে।

এবার একই গার্ড তাঁকে বুট ঠুকে স্যালুট করল।

তারানা বললেন, 'আস্তে স্যালুট মারুন, সিপাইজি। আপনার জুতা ফেটে যাবে। মাটি ব্যথা পাবে। কাউকে ব্যথা দিতে হয় না, সিপাইজি। আচ্ছা বলুন তো তখন আপনি আমার সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহার করলেন, আর এখন কেন এত ভালো ব্যবহার করছেন?'

গার্ড বলল, 'তখন আপনি ছিলেন অভিনেত্রী তারানা আর এখন আপনি কাইয়ুমি তারানা (জাতীয় সংগীত)।'

ইয়াহিয়ার এবার আবার বাঙালি চাখতে ইচ্ছা করছে। উফ, বাঙালি নারীরা খুব সুন্দর নাচতে পারে। তাদের নাচের কোনো তুলনা নাই। আর পার্টিতে তারা এমন উচ্ছল। শাড়িতে তাদের যা লাগে! বিশেষ করে, নাভির নিচে শাড়ি পরা মেয়েগুলোর কোনো তুলনাই হয় না।

'ঢাকা যাব ঢাকা যাব ঢাকা যাব...' বলতে থাকেন ইয়াহিয়া।

এর মধ্যে তাঁর স্ত্রী ফাকরা একদিন তাঁর পিন্ডির বাসা ছেড়ে চলে এসেছিলেন প্রেসিডেন্ট হাউসে। দুই সন্তান আলি আর ইয়াসমিনের বিয়ে হয়ে গেছে। এই মহিলা এখন থাকবে, ধর্মকর্ম নিয়ে। না, এসে ঘ্যানঘ্যান করতে শুরু করলেন।

'কী সমস্যা তোমার? বলা নাই কওয়া নাই তুমি প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে এসে হাজির।'

'আপনার নামে লোকজন নানা কথা বলে।'

'লোকজন? লোকজনের সঙ্গে তোমার দেখা হবে কেন?'

'লোকজন মানে মহিলারা।'

'মহিলারাই বা কেন তোমার সঙ্গে এত দেখা করবে?'

'তারা আমার ভালো চায়। তারা বলে, আপনি অনেক মেয়েমানুষের সাথে মেশেন।'

'আমি রাষ্ট্রপতি। আমার কাছে নানা ধরনের লোক আসবে। এটাই স্বাভাবিক।'

'কিন্তু মহিলারা যে আসে?'

'আমি মেয়েদেরও রাষ্ট্রপতি, ছেলেদেরও রাষ্ট্রপতি।'

'তারা আপনার সাথে ঘুমায়?'

'এক চড়ে বত্রিশটা দাঁত ফেলে দেব। আমার বয়স ৫২। দেশের চিন্তায় আমি মারা যাই। আমার ঘুমানোর টাইম আছে?'

'ঘুমাতে হলে আপনি আমার কাছে আসবেন।'

'আমার ঘুম হারাম হয়ে গেছে। আর তোমারই বা এই বয়সে এত ঘুমানোর সাধ হয় কেন? বাজারের মেয়েমানুষ হয়ে যাচ্ছ নাকি। যাও, বাড়ি যাও।'

ফাকরা কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যান তাঁদের বাড়িতে।

ইয়াহিয়ার পেরেশান লাগছে। তিনি বাঙালি নারীদের কোমর ধরে নাচবেন। ওপরওয়ালা তাঁর ইচ্ছা পূরণ করে দিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে দিলেন প্রবল বন্যা।

ইয়াহিয়া ডাকলেন তাঁর পাত্র-মিত্র, অমাত্যদের।

'এই সুযোগ, আমি ইলেকশনের ডেট পিছিয়ে দিতে চাই।'

'একেবারেই পিছিয়ে দিলে ভালো, স্যার।'

'না, একেবারে পেছানো যাবে না। তিন মাস পেছাব।'

'তিন মাস পেছালে কী লাভ হবে, জনাব।'

'তিন মাস পেছালে আওয়ামী লীগ হয়রান হয়ে যাবে। মুজিবের টাকা শেষ হয়ে আসবে। তখন আর সে প্রচার-প্রচারণা করতে পারবে না। আমরা মুসলিম লীগ আর ইসলামি দলগুলোকে সহায়তা করব। তাতে তারা কিছু সিট বেশি পাবে। কেমন ভেবেছি?'

'খুব ভালো, জনাব। আসলে আপনি যা ভাবতে পারেন না, স্যার! আপনার কোনো তুলনা নাই, স্যার।'

'আমরা চাই ঝুলন্ত পার্লামেন্ট। আমরা চাই দলগুলো কুকুরের মতো কামড়াকামড়ি করুক।'

'আপনার এই বুদ্ধি দারুণ হয়েছে, স্যার।'

'আমি ঢাকা যাব। বন্যা-উপদ্রুত এলাকায় রিলিফ ওয়ার্ক করব। তারপর মুজিবকে ডেকে চা খাওয়াব। সে তো আবার হুইস্কি খায় না।'

'হুইস্কিটা স্যার আপনি ভুট্টোকে খাইয়ে যান।'

'আচ্ছা, সেটাও তো একটা কথা।'

পিআইয়ের বিমান স্পর্শ করল ঢাকা বিমানবন্দর তেজগাঁওয়ের রানওয়ে।

বেরিয়ে এলেন প্রেসিডেন্ট। তাঁকে বরণ করে নেবার জন্য প্রটোকল অনুযায়ী দাঁড়িয়ে আছে সামরিক-বেসামরিক কর্তাদের দীর্ঘ সারি।

ইয়াহিয়া এবার আর কোট প্যান্ট টাই পরেননি। পরেছেন বুশ শার্ট। তাঁর বুকের বোতাম খোলা। সেখান দিয়ে তাঁর গোলাপি বুকের সাদা পশম বেরিয়ে এসেছে। তিনি আজকে কোনো রকমের হাসি-তামাশা করছেন না। একজন সাংবাদিক তাঁকে জিগ্যেস করলেন, 'নির্বাচনের তারিখ কি পিছিয়ে দেওয়া হতে পারে?'

'কী? আপনি কী নিয়ে কথা বলছেন? আমরা সবাই ব্যস্ত বন্যা নিয়ে, কীভাবে বন্যার্ত মানুষকে রক্ষা করা যায় তা নিয়ে, আর আপনি আছেন নির্বাচন নিয়ে? এটা নির্বাচন নিয়ে কথা বলার সময়?'

লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা। একজন ঢাকার ডিসি। তিনি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনি এখানে কী করছেন? আপনার

তো এখন থাকার কথা বন্যা-উপদ্রুত এলাকায়। মানুষের সেবা করার কথা। ত্রাণ তৎপরতার দেখভাল করার কথা? আর আপনি এখানে এসেছেন আমাকে সালাম করতে?'

ডিসি সাহেব থরথরিয়ে কাঁপতে লাগলেন।

ইয়াহিয়া তাঁর শিংয়ের মতো উঁচিয়ে থাকা ভুরু কাঁপিয়ে ভেতরের হাসি দমন করলেন।

ঢাকার রাস্তাতেও পানি উঠে গেছে। ডুবে গেছে শহরের রাজপথও, কোথাও কোথাও।

ইয়াহিয়া একটা হুড খোলা জিপ নিলেন, পাশে বসালেন প্রদেশের গভর্নর আহসানকে। সব প্রটোকল ভেঙে তিনি রাজপথের পানিতে চাকা ডুবিয়ে পানি ছিটিয়ে গাড়ি চালিয়ে দেখতে লাগলেন মানুষের দুর্ভোগ। গাড়ি চালাতে চালাতেই তিনি বললেন, 'আহসান, আমি ইলেকশন পিছিয়ে দিতে চাই।'

'স্যার?' প্রশ্নবোধক চিহ্ন মুখে তুলে ১৯৭০-এর আগস্টের গরমে ঘামতে ঘামতে বললেন আহসান।

'তাতে তিন মাস বেশি সময় পাওয়া যাবে। এখানকার ইসলামি দলগুলো প্রচারের সময় পাবে। আর রমজান এসে যাবে। রমজানের পরপরই ভোট হবে। তখন ইসলামি দলগুলো কিছু ভোট বেশি পাবে।' তিনি তাঁর ফ্লাস্ক বের করে পানি খেলেন। পানি নয়, ভেতরে ছিল কনিয়াক।

ইয়াহিয়া গেলেন কুমিল্লায়। সেখানে তিনি উঠে পড়লেন রিকশায়। জলমগ্ন পথে রিকশা চলছে। জনতা ভিড় করল। কেউ স্লোগান দিয়ে উঠল, 'আইয়ুব খান, জিন্দাবাদ।'

আইয়ুব খান যে আর ক্ষমতায় নাই, এর বদলে এসেছেন ইয়াহিয়া। এই জনতা তাও জানে না?

ইয়াহিয়া খান আশ্বস্ত বোধ করলেন। এরা এখনো অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষেই আছে। ভোট হোক। অসুবিধা নাই।

ঢাকায় ইয়াহিয়া বসলেন শেখ মুজিবের সঙ্গে। তাঁকে বললেন, '১৬ হাজার ভোটকেন্দ্র, হাজার হাজার পোলিং অফিসার—এই অফিসারদের সবাই ব্যস্ত রিলিফ ওয়ার্ক নিয়ে—এর মধ্যে ভোট করব কীভাবে?'

শেখ মুজিব বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই ভোট পিছিয়ে দেবার কথা ভাবছেন না। ভোট যদি বানচাল হয়ে যায়, সমস্ত বাংলাদেশ অচল করে দেব।'

মনে মনে মুজিব হিসাব কষছেন, তাঁর এখনো কোন কোন এলাকায় যাওয়া বাকি। পূর্ব বাংলায় এবং পশ্চিম পাকিস্তানে।

মুজিবকে বিদায় দিয়ে ইয়াহিয়া মেতে উঠলেন তাঁর নিয়মিত কৌতুকানন্দে।

নর্তকী এসেছে। নাচের আসর বসবে। মদের বোতল খোলা হচ্ছে সারি সারি। সন্ধ্যা নাগাদ এসে গেল পার্টি-কন্যারা।

বাঙালি নারীদের কোনো তুলনা হয় না। এরা পারেও।

দুই পাশে দুজন নারীকে বসিয়ে তাদের গাল টিপতে টিপতে ভাবলেন তিনি।

চার দিন পর আবার মুজিবের সঙ্গে বসেছেন ইয়াহিয়া। বললেন, 'শেখ সাহেব, অক্টোবরে নয়, নির্বাচন হবে ডিসেম্বরে।'

মুজিব ইয়াহিয়ার চোখের দিকে তাকালেন। লোকটা কি আমাকে নিয়ে খেলছে? বোঝার চেষ্টা করলেন তিনি। তাঁর আগের চিন্তা আবার তাঁর মাথায় এল। নির্বাচন না হলে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। গেরিলাযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে।

ইয়াহিয়া বললেন, 'ডিসেম্বরের ৭ তারিখে ভোট হবে।'

মুজিব খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, 'ঠিক আছে। ডিসেম্বরের ৭ই সই। কিন্তু এরপর যেন নির্বাচন পেছানো না হয়।'

ইয়াহিয়া তাঁর ভেতরের খুশি ভেতরে আটকে রাখতে পারছিলেন না। তিনি বললেন, 'মুজিব, তুমি লোকটা ভালো।'

মুজিব বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গে ইয়াহিয়া নির্দেশ দিলেন, 'কালকের ওই মহিলাটাকে খবর দাও।'

'কোনটাকে স্যার?'

'ওই যে?'

'লম্বা হিলহিলেটা, স্যার?'

'না। না।'

'মোটা করে, বেঁটে করে।'

'না না।'

'কালো করে, চিবুকের মাঝখানে কাটা?'

'না না।'

'আপনার সঙ্গে বাথরুমে ঢুকে পড়েছিল যেটা?'

'আরে না।'

'ছেলেদের মতো দেখতে। একটু গোঁফ আছে?'

'আরে না...'

ইয়াহিয়া বসে আছেন পিআইয়ের বিশেষ ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমানে। তাঁর সামনে এক কার্টন বেনসন অ্যান্ড হেজেস সিগারেট। বিয়ারের ক্যান বেরোচ্ছে বিমানের ফ্রিজ থেকে। একটার পর একটা। তিনি বিয়ারে চুমুক দিচ্ছেন। ১৫০০ থেকে ২০০০ ফুট উঁচুতে বিমান চলছে। ইয়াহিয়া সাইক্লোন-বিধ্বস্ত বাংলার উপকূল দেখছেন।

জলমগ্ন বাংলার রূপ দেখে তিনি মুগ্ধ।

যদিও তাঁর চীন সফরের ঘোর কাটেনি। হেলিকপ্টারে বসেই তিনি ভাবছিলেন, কোথায় ছিলাম আর কোথায় এলাম। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। তিনি বললেন, 'আমেরিকা চীনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনস্থাপন করতে চায়। নিক্সন তাঁর একজন প্রতিনিধি পাঠাতে চান পিকিংয়ে। আপনারা তাঁকে আসার অনুমতি দিন। আমি এই বার্তা নিক্সনের কাছে পৌঁছে দেব।'

চৌ এন লাই বললেন, 'আমি আপনাকে কাল জানাব। চেয়ারম্যান মাও সে তুংয়ের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

পরের দিন চৌ এন লাই জানালেন, 'আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছ থেকে এই প্রস্তাব পাচ্ছি যে আমেরিকা আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক

স্থাপনে আগ্রহী। তবে এই প্রথম কোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান আমাদের কাছে এমন বার্তা সরাসরি পাঠালেন। আমরা অবশ্যই এই বার্তাকে গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছি। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধিকে বরণ করে নিতে আমরা রাজি আছি।'

শুনে ইয়াহিয়ার খুশি আর ধরে না।

সেই আনন্দ নিয়ে তিনি দেশে ফিরছেন।

আর এদিকে কী কথা।

সাইক্লোন-জলোচ্ছ্বাস বয়ে গেছে পূর্ব পাকিস্তানে। তাঁকে এখন এই সব দেখতে হবে। তিনি কোনো ফুলেফেঁপে ওঠা লাশ দেখতে চান না। এর চেয়ে এই ভালো। এই আকাশ থেকে পাখির চোখ দিয়ে জলমগ্ন উপকূল দেখা।

তিনি বিমান থেকে নেমে প্রদেশের প্রধান সচিবকে বললেন, 'আপনারা এত বাড়িয়ে কথা বলেন কেন। আমি নিজের চোখেই তো দেখলাম। ক্ষয়ক্ষতি মোটেও তেমন কিছু নয়।'

রাতের বেলা তিনি বাছাই করা নারীদেরই কেবল আতিথেয়তা দিলেন তাঁর প্রেসিডেন্ট হাউসের পার্টিতে।

পরের দিনই ইসলামাবাদের উদ্দেশে উড়াল দিতে হাজির হলেন তেজগাঁও এয়ারপোর্টে।

তাঁর সামনে কত কাজ। চীন সফরের কথা জানাতে হবে তাঁর বন্ধু নিক্সনকে।

মাত্র এক মাস আগে হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্ট নিক্সন তাঁকে বলেছেন, 'আমি আশা করি, আপনি ফ্রান্সের মতো শক্ত প্রেসিডেন্সি চালিয়ে যাবেন।'

ইয়াহিয়া উত্তরে বলেছেন, 'হ্যাঁ। তা না হলে পাকিস্তান ভেঙে যাবে।'

নিক্সন তাঁর বন্ধুর জন্য একটা কাজ করেছেন। প্রেসিডেন্টের বিশেষ ক্ষমতা ব্যবহার করে পাকিস্তানের জন্য অস্ত্র সরবরাহে রাজি হয়েছেন। ১৯৬৫-এর যুদ্ধের পর পাকিস্তান ও ভারতে অস্ত্র সরবরাহ আমেরিকায় নিষিদ্ধ। নিক্সন বলেছেন, হোয়াইট হাউসে এখন পর্যন্ত যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে ইয়াহিয়ার চেয়ে বড় কোনো বন্ধু আর নাই।

তাঁর এই বন্ধুর জন্য তিনি একটা কাজ করতে পেরেছেন। তিনি চীনের

প্রধানমন্ত্রীকে রাজি করিয়েছেন আমেরিকার প্রতিনিধিকে গ্রহণ করতে।

ভয়াবহ সাইক্লোন বয়ে গেছে পূর্ব বাংলার ওপর দিয়ে। ১৫০ মাইল বেগে তুফান আঘাত এনেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ২০ ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস। পুরো উপকূল ধুয়ে গেছে, মুছে গেছে, লন্ডভন্ড হয়ে গেছে। আমেরিকার পররাষ্ট্র দপ্তরের রিপোর্ট, ৫ লাখ মানুষ মারা গেছে। আমেরিকান সাহায্য সংস্থা বলছে, মৃতের সংখ্যা দুই লাখ ত্রিশ হাজার। বাঙালিরা বলছে, দশ লাখ মারা গেছে।

ইয়াহিয়া বলছেন, 'কই, তেমন কিছুই তো দেখলাম না।'

ঢাকায় আমেরিকান কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাডের স্ত্রী ত্রাণসামগ্রী নিয়ে হেলিকপ্টারে করে যাচ্ছেন উপদ্রুত এলাকায়, ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে কতগুলো কালো কালো বিন্দু। তাঁর মনে হলো, পুডিংয়ের ওপরে কিশমিশ ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। হেলিকপ্টার নিচে নামতেই দেখা গেল সেসব আসলে মানুষের লাশ।

ঘটনার সাত দিন পরও সব লাশ সৎকার হলো না। আমেরিকান সৈন্যরা এসে কাজ করছে, ব্রিটিশ সৈন্যরা কাজ করছে, ফরাসি সৈন্যরা কাজ করছে, রুশ সৈন্যরা কাজ করছে। তারা লাশ উদ্ধার করে গণকবর দিচ্ছে, মানুষের হাতে পৌঁছে দিচ্ছে খাবার আর পানি, তৈরি করে দিচ্ছে অস্থায়ী বাসস্থান।

নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর সাংবাদিক শনবার্গ বললেন, নদীতে এখনো লাশ ভাসছে, গণকবর খোঁড়া চলছে কোদাল দিয়ে, বাতাসে লাশের গন্ধ, প্রত্যেকে তাই মুখোশ পরে আছে, চুন ছিটানো হচ্ছে লাশের ওপর।

আর ইয়াহিয়া চকচকে বুট পরে হাতে সোনা দিয়ে বাঁধানো লাঠি নিয়ে উঠে গেলেন বিমানের দিকে। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, তিনি হাত নেড়ে উড়িয়ে দিলেন সবকিছু, যেন কিছুই হয়নি।

শেখ মুজিব নির্বাচনী প্রচার অভিযানে ছিলেন যশোরে। প্রবল ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পরপরই তিনি ছুটে গেলেন উপকূলীয় এলাকায়। লঞ্চে করে তিনি একটার পর একটা উপদ্রুত এলাকায় হাজির হতে লাগলেন। দশ দিন ধরে পরিচালনা করলেন ত্রাণকাজ। তারপর ঢাকায় ফিরে এসে সাংবাদিকদের সামনে বললেন, 'পাকিস্তানের সৈন্যরা কোথায়। এত

বিপুলসংখ্যক সৈন্য আছে পাকিস্তানের আর পটুয়াখালীতে আমাদের মানুষের লাশ দাফন করছে ব্রিটিশ সৈন্যরা! আজ আমরা এই সংকল্প করছি যে উপকূলীয় এলাকায় আমাদের ভাইদের ওপরে যা ঘটেছে, ভবিষ্যতে তা আর ঘটতে দেওয়া হবে না।'

ইয়াহিয়ার গোয়েন্দা সংস্থায় কাজ করেন কাশেম মিয়া।

তিনি নিজে বাঙালি।

ভোটে কে জিতবে, এই বিষয়ে তাঁকে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। তিনি কাজ করেন রংপুর এলাকায়। আবার রিপোর্ট করতে তাঁকে মাঝেমধ্যে ঢাকাতেও যেতে হয়। ঢাকায় যাওয়া বড় ঝক্কি। ট্রেনে করে যাও ফুলছড়ি ঘাট। তারপর স্টিমারে বাহাদুরাবাদ। দুই দিন লেগে যায় রংপুর থেকে ঢাকায় যেতে।

তিনি চারদিকে তাকিয়ে দেখেন শুধু নৌকা আর নৌকা।

সারা পূর্ব বাংলা যেন জেগে উঠেছে। সাড়ে সাত কোটি মানুষের মুখে স্লোগান: 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা মেঘনা যমুনা'; 'তোমার নেতা আমার নেতা, শেখ মুজিব শেখ মুজিব'; 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো', 'নৌকা নৌকা...'

শেখ মুজিব যেখানে যান, লাখ লাখ লোক জড়ো হয় সেখানে। তারা সবাই পাঞ্জাবিদের এত দিনের শোষণ ও দুঃশাসনের অবসান চায়। আর তা তাদের দিতে পারেন একজন মানুষ—শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৯ সালে যাঁকে খেতাব দেওয়া হয়েছে বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু তাদের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন সোনার বাংলা গড়ার। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি যেন এক কণ্ঠে স্লোগান ধরেছে: 'জয় বাংলা'।

কাশেম মিয়া জানেন, নৌকা মার্কা জিতে যাবে। সব জায়গাতেই।

রংপুরে, নীলফামারীতে, গাইবান্ধায়, গোবিন্দগঞ্জে। কিন্তু এই কথা রিপোর্টে লেখা যাবে না। তাঁকে বানিয়ে বানিয়ে লিখতে হবে। ছোটবেলায় বানিয়ে বানিয়ে তিনি নৌকাভ্রমণ রচনা লিখেছিলেন। জীবনেও তিনি নৌকায় চড়েন নাই। তাঁর বাড়ি বগুড়ার খিয়ার অঞ্চলে। সেখানে মাটি লাল, নদী নাই। নৌকায় চড়া তাঁর হয় নাই। তিনি গরুগাড়ি চড়েছেন, মোষের গাড়ি চড়েছেন, ঘোড়ার গাড়ি চড়েছেন, খচ্চরের গাড়ি চড়েছেন, স্টিমারে চড়েছেন, লঞ্চেও চড়া হয়েছে। কিন্তু তাঁকে লিখতে হলো নৌকাভ্রমণ। তিনি বানিয়ে বানিয়ে লিখে ফেললেন।

আজকেও তাঁকে বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা লিখতে হবে। গুছিয়ে লিখতে হবে, যেন বিশ্বাসযোগ্য হয়। তিনি লিখলেন, 'আওয়ামী লীগের প্রার্থীর প্রতীকের জোর বেশি, মুসলিম লীগের প্রার্থীর বংশপরিচয় ও টাকার জোর বেশি। ফলে খুব কঠিন প্রতিযোগিতা হইবে। উভয় পক্ষই বিজয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। তবে একজন দুইজন এই রকমও বলে, ভোট দিব পাল্লায়, যা করেন আল্লায়। ইহাদের সংখ্যা খুব বেশি নহে। মূল প্রতিযোগিতা তাই হইবে নৌকার সহিত হারিকেন মার্কার।'

ইসলামাবাদে প্রেসিডেন্ট হাউসে বসে ইয়াহিয়া খান বিভিন্ন সংস্থার পাঠানো রিপোর্টগুলো দেখেন। পূর্ব পাকিস্তানে নৌকা ৮০টা আসন পেতে পারে, বাকিরা ৮২টা। পশ্চিমে ভোট পুরাটাই ভাগ হবে। কেউ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে বলে মনে হয় না। সে ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগই হচ্ছে সবচেয়ে বড় দল। তবে ৩০০ আসনে ৮০টা আসন পেয়ে তারা সুবিধা করতে পারবে না। আচ্ছা ৮০টা নয়, ১০০টাই না হয় পেল। কিংবা ১২০টা। বাকি ১৮০টা তো থাকবেই। মুসলিম লীগ ইয়াহিয়ার কথা শুনবে। জামায়াতে ইসলামীও শুনবে। এখানে ভুট্টো আর ওখানে মুজিব। তারা দুজনেই মুশকিল আদমি। তবে তারাই বড় দল।

তাঁর সামনে বসে আছেন তাঁর মন্ত্রী ও উপদেষ্টা জি ডব্লিউ চৌধুরী।

ইয়াহিয়া বললেন, 'তাহলে ঝুলন্ত পার্লামেন্টই হচ্ছে। কী বলেন?'

'জি স্যার।'

'আওয়ামী লীগ মেজরিটি হচ্ছে না।'

'জি না স্যার।'

'ভুট্টোও এখানে মেজরিটি হবে না। কী বলেন?'

'হবে না, স্যার।'

'আমরা ভোটে কোনো রকমের প্রভাব খাটাব না।'

'জি স্যার।'

'আমরা দেশকে আসল গণতন্ত্র দিচ্ছি।'

'জি স্যার।'

'আইয়ুব খানের পরিণতি থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে।'

'জি স্যার।'

'পূর্ব পাকিস্তানে মেজরিটির বাস। তাদের মশা ভাবলে চলবে না।'

'জি না স্যার।'

'যদিও আমি তাদের মশা বলেই ডাকি।'

'সে তো স্যার আদর করে।'

'ভুট্টো একটা হারামজাদা, কী বলেন?'

'স্যার।'

'মুজিব ভুট্টোর চেয়ে ভালো।'

'লোক হিসেবে যদি বলেন, ইয়েস স্যার।'

'সে আমার সাথে গাদ্দারি করবে না। কী বলেন?'

'করার কথা না, স্যার।'

'আমার সাথে তার কথা হয়েছে। সেসব রেকর্ড আছে।'

'জি স্যার।'

'সে বলেছে, আমাকে প্রেসিডেন্ট রেখে দেবে।'

'জি স্যার।'

'ভুট্টোও বলেছে, সে আমাকে প্রেসিডেন্ট রেখে দেবে।'

'জি স্যার।'

'আমাকে পীরজাদা বলছে, মুজিব মেজরিটি হয়ে যেতে পারে।'

'স্যার।'

'মুজিব মেজরিটি হলে আমার কী করার আছে। সাড়ে সাত কোটি মানুষ যদি মুজিবকে ভোট দেয়, তাহলে সেটা আমাকে মানতে হবে। রাইট।'

'রাইট স্যার?'

'আপনি পান করছেন না কেন? স্কটল্যান্ড সুন্দর দেশ। তাদের

মেয়েরাও খুব সুন্দর। কিন্তু ওরা যদি স্কচ হুইস্কি না বানাত, পৃথিবীটাই অসুন্দর থেকে যেত। কী বলেন?'

'জি স্যার।'

'আমাদের জীবনটাকে সুন্দর করার জন্য আমাদের স্কটল্যান্ডের প্রশংসা করতে হবে। ব্রিটিশরাজ জিন্দাবাদ।'

'জি স্যার।'

'ব্রিটিশরাজ।'

'জিন্দাবাদ স্যার।'

'তবে মুজিব যদি এলএফও না মানে, তাহলে?'

'তাহলে তো স্যার, প্ল্যান বি রেডি।'

'আমরা সামরিক আইনের বিধি কঠোরভাবে প্রয়োগ করব।'

'রাইট স্যার।'

'আমার সৈন্যরা প্রস্তুত।'

'জি স্যার।'

'যদিও ওরা বলে আমার সৈন্যরা প্রস্তুত নয়।'

'বাজে বলে, স্যার।'

'আমাকে ঢাকা এয়ারপোর্টে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন পর্যন্ত করে বসল, "মিস্টার প্রেসিডেন্ট, ক্ষমতা কি আপনার হাতে আছে? ক্ষমতায় কি আপনি আছেন?" আমি মাছি তাড়ানোর মতো করে প্রশ্নটা উড়িয়ে দিলাম। আমি ছাড়া আর কেউ কোনো ক্ষমতা রাখে না। ঠিক করিনি?'

'অবশ্যই ঠিক করেছেন, স্যার।'

'মুজিব আমাকে বলেছে, ছয় দফা মানে পাকিস্তান ভাঙা নয়। বলেনি?'

'বলেছে স্যার।'

'আমি নির্বাচন না পিছিয়ে ঠিক করেছি কি না?'

'ঠিক করেছেন, স্যার।'

'কারণ সে বলেছে, নির্বাচন হতে না দিলে সে স্বাধীনতা ঘোষণা করবে। গেরিলাযুদ্ধ করবে। তাতে আর যা-ই হোক, পাকিস্তান থাকে না।'

'জি স্যার।'

'থ্যাংক গড, পাকিস্তান ইজ সেভড।'

'তুমি কি আমার সঙ্গে মুজিবের বৈঠকের টেপ রেকর্ড শুনেছ।'

'শুনেছি স্যার।'

'মুজিব প্রতিজ্ঞা করেছে আওয়ামী লীগ যে সংবিধানের খসড়া বানাবে, সেটা আমাকে দেখিয়ে নেবে।'

'স্যার, একটা কথা।'

'বলুন।'

'আওয়ামী লীগের বানানো সংবিধানের একটা খসড়া আমার কাছে আছে, স্যার।'

'আচ্ছা। কী মনে হলো?'

'ওটা কার্যকর হলে পাকিস্তান আর থাকে না, স্যার।'

'আরে ওটা তো দিয়েছে বারগেইন করার জন্য। তুমি যদি পিস্তল পেতে চাও, তোমাকে কামান চাইতে হবে।'

'ওরা ট্যাংক চাচ্ছে, স্যার।'

'আমরা তাহলে কামান দেব।'

'নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মেজরিটি হয়ে গেলে একটু ক্ষতিই হবে, স্যার।'

'কেন, বলো তো?'

'মুজিব বলেছে, এটা ৬ দফা প্রশ্নে গণভোট। তখন মুসলিম লীগের নুরুল আমিন প্রতিবাদ করল। মুজিব বলল, "গান্ধীজি বাধা দিয়েছে, নেহরু বাধা দিয়েছে, তার পরেও ১৯৪৬-এর আগে গণভোটে আমরা জয়লাভ করে পাকিস্তান এনেছি। এবারও একই রকমভাবে নুরুল আমিন আর তার পশ্চিমা প্রভুদের ষড়যন্ত্র সত্ত্বেও আমরা জিতে যাব।" তার মানে ১৯৪৬-এ গণভোট করে যেমন করে আলাদা দেশ আনা গেছে, তেমনি করে ভোটের মাধ্যমে মুজিব আলাদা দেশ আনতে চায়।'

'ডোন্ট ওয়ারি। উই উইল নট অ্যালাউ দিজ ব্ল্যাক বাস্টার্ডস রুল ওভার আস।'

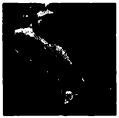

নির্বাচনের রাতে নির্বাচনের ফলাফল প্রচার করা হবে রেডিও-টেলিভিশনে। সবাই মিলে টেলিভিশন দেখা হবে। রেডিও শোনা হবে। আর চলবে নাচ-গান, খানাপিনা। পিন্ডির এক হোটেলের বলরুমে ব্যাপক আয়োজন। ইয়াহিয়া সেখানে যাবেন। পেশোয়ার থেকে নর্তকী আনা হচ্ছে। তাদের বেলি ডান্স অপূর্ব। শামীম এসে গেছেন পিন্ডিতে। বাঙালি বিউটির কোনো তুলনা নাই। তিনি তো একটা ব্ল্যাক ডায়মন্ড। নুরজাহান আসবেন লাহোর থেকে, তাঁর অপরূপ সংগীত আর যৌবনসুধা নিয়ে। আকলিম আসবেন। তাঁর সংগ্রহের অন্য নারীরাও আসবেন। অফিসারদের মিসেসরা আসবেন। ফুলে ফুলে মধু ঢলঢল করবে। প্রজাপতির মতো ফুল থেকে ফুলে গিয়ে তিনি মধু পান করবেন।

সন্ধ্যার একটু পরই ভোটের ফল আসতে শুরু করল। সবে তো কলির সন্ধ্যা।

ইয়াহিয়া সোফায় বসেছেন। তাঁর কোলে বসেছেন একজন। দুই হাতলে দুজন। একজন গালিচায় বসে তাঁর কোলেরটাকে সরানোর চেষ্টা করছেন।

মধ্যরাতে পার্টি জমে ওঠার কথা। কিন্তু জমছে না।

কারণ, নির্বাচনের ফল আসতে শুরু করেছে। পশ্চিমে ভালো করছে ভুট্টোর দল পিপিপি।

পূর্বে আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কেউ কোনো আসনই পাচ্ছে না। তা যদি হয়, ১৫২টা আসনে নির্বাচন হয়েছে, আর আটটা বাকি আছে সাইক্লোন-উপদ্রুত এলাকায়, এখনই মুজিব ১৫১ অতিক্রম করে যাবেন, তাহলে তাঁর আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হয়ে যাবে। এদিকে পশ্চিমে সবচেয়ে বড় দল হিসেবে আবির্ভূত হলো পিপিপি। ভুট্টোর দল। যদিও তাঁর প্রাপ্ত আসনসংখ্যা আওয়ামী লীগের অর্ধেক।

মশারা হাতিকে শাসন করবে।

বাঙালি শাসন করবে পাঞ্জাবিদের।

ইয়াহিয়া মিসেস শামীমকে নিয়ে হোটেলের রুমে চলে গেলেন। আজ এই বাঙালি মহিলাকে তিনি ধ্বস্ত করবেন। পিষ্ট করবেন। বাঙালি শাসন করবে পাঞ্জাবিকে। এটা হতেই পারে না।

শামীম বললেন, 'আমি আপনার ওপরে উঠব।'

ইয়াহিয়া গলা ভারী করে বললেন, 'খবরদার। বাঙালি লাড়কি নিচে থাকবে। পাঞ্জাবি মরদ ওপরে থাকবে। এটাই নিয়ম।'

কিন্তু দেখা গেল কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি নিজেই ধ্বস্ত হয়ে পড়েছেন।

সাদা বিছানায় দুজনই নগ্ন। রুমের লাইট জ্বলছে।

গোলাপি রঙের ইয়াহিয়া শ্যামল বর্ণের এক নারীর পা ধরে হাউমাউ করে কাঁদছেন—এ কী হলো, এ কী হলো, আমার গোয়েন্দারা কী বলল, আর ভোটের রেজাল্ট কী হলো!

ইয়াহিয়া দুই দিন ঝিম মেরে থাকলেন। ঘর থেকে বেরোলেন না। তৃতীয় দিনে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বলতে লাগলেন, সব ঠিক আছে।

তিনি সশস্ত্র বাহিনীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিলেন সুন্দর, নিরপেক্ষ নির্বাচন করার জন্য।

তিনি ঠিক করলেন, তিনি ঢাকা যাবেন।

যাবেন করাচি হয়ে।

করাচি থেকে ইউসুফ চান্দিও তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন পাখি শিকারের। নারী শিকার ও পাখি শিকার—এই দুইয়ের আমন্ত্রণ ইয়াহিয়া ফেলতে পারেন না। ইউসুফ চান্দিও প্রাদেশিক পরিষদে মুসলিম লীগ (কাইয়ুম) থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। খুবই বিরল সুযোগ। কারণ, মুসলিম লীগ জিতেছেই খুব কম আসনে।

করাচিতে দুজনে পাখি শিকারে মগ্ন।

চান্দিও বন্দুকে টোটা ভরতে ভরতে বললেন, 'সাঁই, এখন কী হবে? নির্বাচনে একদিকে উত্থান ঘটেছে এক গোঁয়ারের। পূর্ব পাকিস্তানে সে জিতেছে। আর পশ্চিমে জিতেছে এক পাগলা কুত্তা।'

ইয়াহিয়া একটা পাখির দিকে বন্দুক নিশানা করে বললেন, 'বাচ্চো, চিন্তা কোরো না। বরং কী তামাশা হতে যাচ্ছে, তা-ই শুধু দেখো। আমি এমন টোপ ফেলব, হয় কুকুরটা খতম করবে গোঁয়ারটাকে, না হয় গোঁয়ারটা খতম করবে কুকুরটাকে। আর তা না হলে সিংহ সাবাড় করবে দুটোকেই।'

এরপর ইয়াহিয়া উড়াল দিলেন ঢাকার উদ্দেশে। কারণ, শেখ মুজিব কোনো রকমের আলোচনার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে যেতে অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমি মেজরিটি পার্টির নেতা, আমার সঙ্গে আলোচনা করতে হলে আমার শহরে আসতে হবে।'

ইয়াহিয়া জানেন তিনি কী করবেন। তিনি এক ঢিলে দুই পাখি মারবেন।

কিন্তু ভুট্টোর সঙ্গে পেরে ওঠা খুবই মুশকিল।

ভুট্টো সেনাবাহিনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে খাতির দিয়ে চলেন। তিনি দিনের পর দিন সেনাকর্তাদের বাড়িতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকেন। আর রাতের খাবার না খেয়ে ফেরেন না।

ভুট্টো নিজে এক নম্বরের নারীবাজ। সারাক্ষণ থাকেন হুইস্কির ওপরে। গ্রামে তাঁর বউ আছে। শিরিন আমির ভুট্টো। তা সত্ত্বেও তিনি আরেকটা বিয়ে করেছেন। নুসরাতকে। কিন্তু এর পরও তাঁর নারীবন্ধুর অভাব নাই। ঢাকার হুসনা শেখ নামে এক মহিলা তাঁর রক্ষিতা। আকলিমের সঙ্গেও তাঁর খাতির। আকলিম বলে থাকেন, তিনি ভুট্টোকেই বেশি পছন্দ করেন ইয়াহিয়ারও চাইতে। এই খবর ইয়াহিয়ার কানেও পৌঁছেছে। যদিও আকলিমের জায়ের সঙ্গেই ভুট্টোর প্রেম। মেয়েরা ভুট্টোর প্রেমে পড়বে, এটাই স্বাভাবিক। তিনি ক্যালিফোর্নিয়া থেকে পড়াশোনা করে এসেছেন। বাবা জমিদার ছিলেন। সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম হয়েছে তাঁর। তিনি আমেরিকাতেই ছিলেন ডিবেটের চ্যাম্পিয়ন। দেখতে-শুনতে ভালো। তাঁকে মেয়েরা প্রথম দেখাতেই পছন্দ করে। তবে দ্বিতীয় দেখাতে তাঁর কাছে মেয়েরা যেতে চাইবে কি না, বলা মুশকিল। খুবই বিরক্তিকর এক লোক।

আইয়ুব খান তাঁকে মন্ত্রিসভায় নিয়েছিলেন। আবার বের করেও দিয়েছিলেন। পরে জেলে ঢুকিয়েছিলেন।

নারী সরবরাহ করে করে তিনি বহু জেনারেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেছেন। এখন পীরজাদাসহ বহুত জেনারেল মনে করেন, শেখ মুজিবকে ক্ষমতা দেওয়ার দরকার নাই। সামরিক আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করে নির্বাচন বাতিল করে দিলেই হলো। আবার কেউ কেউ মনে করেন, ভুট্টোকে ক্ষমতা দিলেই হয়। নির্বাচনের পর জেনারেলরা আর ইয়াহিয়া খানের পেছনে আছেন কি না, এইটাই তাঁর সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা।

বিমান নামল ঢাকা বিমানবন্দরে।

প্রেসিডেন্ট চলে গেলেন রমনা পার্কের কাছেই, প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে। রানি এলিজাবেথের জন্য এই প্রাসাদটা বানানো হয়েছিল।

বছরের অন্য সময় এটা পড়েই থাকে। প্রেসিডেন্ট এলেই ভবনটা হয়ে ওঠে সরগরম। নারীরা আসে, একে একে, কিছুক্ষণের মধ্যেই এটা হয়ে ওঠে নারীস্থান।

পরের দিন ইয়াহিয়া মুজিবের সঙ্গে একা একা কথা বললেন। তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলেন, মুজিব এখন অনেক বেশি শক্ত। তাঁর চোখ-মুখে প্রত্যয়ী ভাব। মাথা উঁচু। চিবুক ঋজু।

ইয়াহিয়া বললেন, 'আপনার আমাকে খসড়া সংবিধান দেখানোর কথা।'

মুজিব বললেন, 'আমি মেজরিটি পার্টির নেতা। আপনি আগে অ্যাসেম্বলি কল করুন। আমরা যা আলোচনা করব জাতীয় পরিষদেই তা করব। আপনি প্রেসিডেন্ট, আপনি সবই জানবেন। বিরোধী দলের একজনও কোনো আপত্তি করলে আমরা তা বিবেচনায় নেব। এটা নিয়ে আপনার আগে থেকেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার দরকার নাই।'

'আপনি ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা করুন।'

'ভুট্টো, নাকি ভুট্টো আর তাঁর জেনারেলদের সঙ্গে?' মুজিব পাইপ টানতে টানতে বললেন।

'আপনি সব জানেন দেখি।' ইয়াহিয়া বললেন।

'আপনি আগে অ্যাসেম্বলি কল করুন। আর তা যদি করতে ব্যর্থ হন,

তাহলে তার পরিণতি হবে ভয়াবহ। সে জন্য প্রস্তুত থাকুন।'

পরের দিন আনুষ্ঠানিক আলোচনা। শেখ মুজিবের সঙ্গে এসেছেন তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামারুজ্জামান, খন্দকার মোশতাক আহমদ আর ক্যাপ্টেন মনসুর আলী। ইয়াহিয়ার সঙ্গে আছেন জেনারেল পীরজাদা এবং অ্যাডমিরাল আহসান।

মুজিব প্রথমেই ইয়াহিয়া খানকে অভিনন্দন জানালেন একটা মুক্ত, অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য।

মুজিব বললেন, 'স্যার, আপনি আমাদের ৬ দফা কর্মসূচি আগে থেকেই জানেন। আপনি বলুন, কোন দফা নিয়ে আপনার আপত্তি আছে?'

ইয়াহিয়া বেনসন অ্যান্ড হেজেসে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন, 'শেখ মুজিব, আমার ছয় দফা নিয়ে কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আপনাকে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদেরকেও আপনার সঙ্গে নিতে হবে।'

'অবশ্যই স্যার। আপনি দয়া করে যত তাড়াতাড়ি পারেন অ্যাসেম্বলি কল করুন। আমি পরামর্শ দেব ১৫ ফেব্রুয়ারি। আপনি দেখবেন, আমি শুধু সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করব না। আমি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করব।'

আহসান বললেন, 'আপনাদের তো একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছেই। তা দিয়ে আপনার পশ্চিম পাকিস্তানি স্বার্থকে বুলডোজার-চাপা দিতে পারবেন।'

মুজিব বললেন, 'না না। আমি একজন গণতন্ত্রী। আমি পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠের নেতা। আমি পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ অগ্রাহ্য করতে পারি না। আমি কেবল পূর্বের বা পশ্চিমের জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নই, আমি সমস্ত পৃথিবীর জনমতের কাছে দায়বদ্ধ। আমি গণতান্ত্রিক রীতির জন্য যা করা সম্ভব তার সবকিছুই করব। আমি আপনাকে বলছি, আপনি শুধু অ্যাসেম্বলি শুরুর তিন-চার দিন আগে ঢাকায় আসবেন। আমি আমাদের সংবিধানের খসড়া আপনাকে দেখাব। আপনি যদি কোনো কিছু আপত্তিকর বলে মনে করেন, আমি অবশ্যই সেটাকে ধারণ করার চেষ্টা করব।'

ইয়াহিয়া চুপ করে রইলেন।

মুজিব আরও বললেন, 'আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট থেকে যাবেন।'

ইয়াহিয়া বললেন, 'না না, আমি একজন সৈনিক। আমি ব্যারাকে কিংবা ঘরে ফিরে যাব। তবে একটা কথা বলি। আপনাকে যা করতে হবে পশ্চিম

পাকিস্তানের নেতাদের সাথে মিলেই করতে হবে। এখানে আপনারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, ওখানে পিপিপি সংখ্যাগরিষ্ঠ। দুদল মিলেই করতে হবে।'

মুজিব বললেন, 'আমি পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোর জন্য কোনো সমাধান চাপিয়ে দিতে চাই না। আমার উপলব্ধি হলো, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলো পূর্ব পাকিস্তানের মতো স্বায়ত্তশাসন না-ও চাইতে পারে, বা তাদের দরকার না-ও হতে পারে। যদি আমাকে অনুরোধ করা হয় আমি সাহায্য করব, তবে নিজে থেকে আমি কোনো রকমের হস্তক্ষেপ করব না।'

১৯৭১ সালের ১৪ জানুয়ারি ইয়াহিয়া খান এয়ারপোর্টে গেলেন। তিনি করাচি যাবেন।

সাংবাদিকেরা তাঁকে ঘিরে ধরলেন।

'কী কথা হলো?'

তিনি বললেন, 'আলোচনা খুব সন্তোষজনক হয়েছে।'

'কী রকম?'

'সেটা আমার বলা উচিত হবে না। শেখ মুজিব পাকিস্তানের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন। তাঁকেই আপনারা জিগ্যেস করুন।'

'কবে অ্যাসেম্বলি বসবে?'

'তারিখ নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি।'

'আপনি কি ভুট্টোর সঙ্গে বৈঠক করবেন?'

'তা জানি না। তবে আমি পাখি শিকার করতে সিন্ধ যাচ্ছি। ওটা আবার ভুট্টোরই এলাকা। সেখানে যদি তিনি থাকেন, তাহলে সম্ভবত তাঁর সঙ্গে দেখা হতে যাচ্ছে।'

সিন্ধু প্রদেশের লারকানা। ভুট্টোর নিজের জায়গা। পাখিশিকারিদের জন্য এক স্বর্গ। হাঁস এসে ভরে থাকে নদী-নালায়। কত রকমের বক। শীতের পাখি।

ভুট্টো তাঁর জমিদারি এস্টেটে আয়োজন করলেন উষ্ণ পার্টির। ইয়াহিয়া গেলেন, সঙ্গে নিয়ে গেলেন আরও দুজন শিকারি সেনাপ্রধান জেনারেল হামিদ আর পীরজাদাকে।

হুইস্কি ভুট্টোর সার্বক্ষণিক সঙ্গী। ইয়াহিয়া বলেন, 'আমি হুইস্কি ছাড়া ১৬ ঘণ্টা কাজ করতে পারব, ভুট্টো এক ঘণ্টাও পারবে না।'

পীরজাদা তো ভুট্টোরই লোক।

শেখ মুজিব ইয়াহিয়াকে প্রেসিডেন্ট হতে বলেছেন, এ কথা শোনার পর ঢাকাতেই পশ্চিম পাকিস্তানি জেনারেলরা ইয়াহিয়াকে ঘিরে ধরেছিলেন, 'আপনি ভারতের রাষ্ট্রপতির মতো নখদন্তহীন প্রেসিডেন্ট কেন হবেন। বরং আপনি সিএনসি থাকুন। তাতে আপনার ক্ষমতা আপনারই থাকবে।'

জানুয়ারির ১ তারিখে হামিদকে জেনারেল পদে উন্নীত করা হয়েছে এবং সেনাবাহিনীর প্রধান পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে।

ভুট্টো বললেন, 'স্যার, মুজিবের সঙ্গে কী আলোচনা হলো? আপনি নাকি ছয় দফা মেনে নিতে সম্মত হয়েছেন? আপনি কেন সম্মত হবেন? বাঙালিরা আমাদের শাসন করবে বলে? পাঞ্জাবিরা চিরকাল পাকিস্তান শাসন করেছে। এবারও পাঞ্জাবকে তার ন্যায্য পাওনা দিতে হবে।'

ইয়াহিয়া বললেন, 'মুজিব খুব কঠোর। সে ছয় দফা থেকে একচুলও নড়বে না। সে আমাকেও বাদ দিতে চায়। তোমাকেও বাদ দিতে চায়।'

ভুট্টো বললেন, 'আমি মুজিবের সঙ্গে বসতে পারি। আমরা ক্ষমতা ভাগ করে নিতে পারি।'

ইয়াহিয়ার হাতের মদের গেলাস ছলকে উঠল। এই দুই বাস্টার্ড পলিটিশিয়ান এক হয়ে গেলে তাঁর কী হবে। আম-দুধ মিলে যাবে, আঁটি যাবে ভাগাড়ে। তা তিনি হতে দেবেন কেন? আর জেনারেলরাই বা কেন মেনে নেবে।

তিনি বললেন, 'মুজিব আপনার সঙ্গে ক্ষমতা ভাগ করবে না। ওই লাইনে ভেবে কোনো লাভ নাই। সে একটা গোঁয়ার-গোবিন্দ। আপনি একা একা তার সঙ্গে কথা বলতে যাবেন না।'

'বাঙালিদের বশ করানোর জন্য আপনাকে কঠোর হতে হবে। ২০ হাজার বাঙালি হত্যা করলেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। আপনি এক কাজ করুন। আপনি অ্যাসেম্বলি কল করা পিছিয়ে দিন। দেখবেন, শেখ মুজিব আপনার প্রতি অনুগত নয়। সে এটা মানবে না। তখন আপনার পক্ষে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা সম্ভব হবে।'

সেনাপ্রধান হামিদ ও ভুট্টোর লোক পীরজাদা এই মতটাকেই সমর্থন করলেন।

তাঁরা ঠিক করে ফেললেন কী করতে হবে।

তারপর তাঁরা পান করতে লাগলেন আনন্দের সঙ্গে। পাকিস্তানের নামে তাঁরা হুইস্কির বন্যা বইয়ে দিতে লাগলেন।

ঢাকার কাগজে ছাপা হলো ভুট্টোর বাড়ি আল মুর্তজার বারান্দায় ভুট্টো আর ইয়াহিয়ার ছবি। বাংলার মানুষ ক্ষোভে ফেটে পড়তে লাগল। সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও ইয়াহিয়া গেলেন না, আর সংখ্যালঘু নেতার বাড়িতে সেনাপ্রধানসমেত গিয়ে হাঁস শিকার করা হচ্ছে?

ক্ষুব্ধ মানুষের ক্ষোভ প্রকাশিত হতে লাগল স্লোগানে—ভুট্টোর পেটে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।

আর্চার ব্লাড নিতান্তই ভদ্রলোক। আমেরিকার ভার্জিনিয়ার মানুষ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, নৌবাহিনীর হয়ে। এখন তিনি কূটনীতিকের চাকরি করেন, আমেরিকার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে। দেশে-বিদেশে তাঁর পোস্টিং হয়। এই মুহূর্তে তিনি আছেন পূর্ব পাকিস্তানে, ঢাকায়, আমেরিকার কনসাল জেনারেল। দশ বছর আগেও তিনি ঢাকায় এসেছিলেন, আমেরিকান দূতাবাসের ডেপুটি প্রিন্সিপাল অফিসার হিসেবে। এখন তিনি এসেছেন তাঁর স্ত্রী মেগ, দুই কন্যা শিরিন (১১) আর বারবারা (৮) এবং ছেলে পিটারকে (৬) নিয়ে। ধানমন্ডি-৮ নম্বরের মাঠের পাশে তাঁর বাসা, অনেক রুম। প্রতিটা রুমের সঙ্গে অ্যাটাচড বাথরুম। মেগ, তাঁর স্ত্রী, বিমান থেকে ঢাকার আকাশ দেখে প্রথম যে মন্তব্যটা করেছিলেন, যেকোনো বিমানযাত্রীই ঢাকার আকাশে প্লেনের জানালা দিয়ে উঁকি দেওয়া মাত্র যা করে থাকে—'এই সবুজ দেশটা তো পুরোটাই পানির নিচে।'

আমেরিকান কনসুলার অফিস মতিঝিলের আদমজী কোর্ট বিল্ডিংয়ে, ভেজা হাওয়ার এই দেশে যেকোনো ভবনের বাইরেটা শেওলাধরা,

আদমজী কোর্ট বিল্ডিংও বাইরে থেকে মলিন। ভেতরেও যে অবস্থা বেশি সুবিধার তা নয়, সবচেয়ে ভয়াবহ লিফটটা, সপ্তাহে পাঁচ দিনই থাকে নষ্ট। আমেরিকান তথ্যসেবা কেন্দ্র বা ইউসিসের অফিস খানিকটা দূরে, মতিঝিলেরই পূর্বাণী হোটেলে।

আর্চার ব্লাড তাঁর চাকরির অংশ হিসেবে নজর রাখছেন পূর্ব পাকিস্তানের এবং পাকিস্তানের ঘটনাপঞ্জির দিকে। এবং সে সম্পর্কিত রিপোর্ট তাঁকে পাঠাতে হয় ওয়াশিংটনে।

নির্বাচন নিয়ে ছিল তাঁর অপার কৌতূহল এবং প্রকৃত আগ্রহ। ভোটের দিন নারী-পুরুষ সবাই বড় বড় লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিচ্ছে—ভোট এ দেশে উৎসব—দেখে তাঁর ভালো লাগল। ভোটে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করেছে, তিনি খুশিই। পাকিস্তানে নিযুক্ত আমেরিকানরা মোটেই পছন্দ করত না ভুট্টোকে, তিনি বামপন্থী হিসেবে পরিগণিত, আমেরিকার বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। মুজিবকেই বরং বেশির ভাগ আমেরিকান, যাদের পোস্টিং হয়েছে পাকিস্তানে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে, পছন্দ করত। ভোটে মুজিব জিতে যাওয়ায় আমেরিকানরা না আবার বেশি উচ্ছ্বাস দেখিয়ে ফেলে, সে জন্য ইসলামাবাদ থেকে সতর্কবার্তা পাঠিয়েছেন স্বয়ং রাষ্ট্রদূত। তাতে তিনি বলেছেন, আমেরিকান দূতাবাসের কোনো কর্মকর্তা যেন ভোটের মূল্যায়ন করে কোনো পাকিস্তানিকে বা কোনো তৃতীয় দেশের নাগরিককে কোনো মন্তব্য করে না বসেন।

বিশেষ করে, ভুট্টোর বিজয়ে আমেরিকান সরকার বিরক্ত হয়েছে কিংবা মুজিবের বিজয়ে খুশি হয়েছে, এরকম কোনো লক্ষণ যেন আমরা না দেখাই।

কিন্তু এই দেশে এখন কী হচ্ছে? আর্চাডের স্ত্রী মেগ বিস্মিত। সকালের নাশতার টেবিলে পাউরুটিতে মাখন লাগাতে লাগাতে তিনি বললেন, 'একটা নির্বাচন হয়েছে। মানুষ একটা দলকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছে। এখন তারা দেশ শাসন করবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু এই দেশে কী ঘটছে এসব, বলো তো।'

আর্চার ব্লাড কিছু বলেন না। তিনি কফিতে ক্রিমার মেশান আর চামচ দিয়ে নাড়তে থাকেন।

মেগ বলেই চলেন, 'আমরা আমেরিকা হলাম মহান গণতন্ত্র। এখানে

একটা গণতন্ত্রের খেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তাতে আমরা ভেবেছিলাম মুজিব জিতে গেলে তারা তাদের দৃষ্টি মুজিবের ওপরে ফেলবে। কিন্তু তারা স্রেফ তাঁকে এক পাশে সরিয়ে রাখার প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। আর আমরা দ্য গ্রেট আমেরিকান জাতি পাশ ফিরে শুয়ে আছি এবং কিছুই বলছি না।'

হেনরি কিসিঞ্জার, প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নিরাপত্তাবিষয়ক উপদেষ্টা, নিঃসঙ্গ নিক্সনের একমাত্র বন্ধু, নিক্সনকে বললেন, 'মুজিব তো জিতে গেছে। সে তো আমেরিকার প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন। আমরা কি মুজিবের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার মহড়া দিতে শুরু করব?'

কিসিঞ্জার বললেন, 'না। এখনই নয়। আমরা এমন কোনো অবস্থান নেব না, যাতে পাকিস্তানের ভাগ হয়ে যাওয়া উৎসাহিত হয়।'

জেনারেল টিক্কা খান। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক আইন প্রশাসক, বেলুচিস্তানের কসাই নামে যিনি বিখ্যাত। বেলুচিস্তানের বিদ্রোহ দমনে নিষ্ঠুরভাবে মানুষ হত্যা করে তিনি এই খেতাব অর্জন করেছেন। তিনি নির্বাচনে ফল বিশ্লেষণের জন্য বিশাল এক বৈঠকের আয়োজন করেছেন। পুলিশের কর্মকর্তা সরদার মুহাম্মদ চৌধুরীও সেখানে উপস্থিত।

একেকজন একেক কথা বলছে। একজন বললেন, 'এটা এ দেশের জনগণের রাজনৈতিক পরিপক্কতার লক্ষণ। এখন এই দেশে একটা দ্বিদলীয় ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, যা গড়ে তুলতে ইংল্যান্ডের লেগেছিল ৫০০ বছর।'

টিক্কা খান বললেন, 'সরদার সাহেব। আপনি বলুন।'

'স্যার। আমি ছোটখাটো মানুষ। আপনারা বড় মানুষ বলছেন। আমি শুনছি। আমি কী আর বলব।'

'না না বলুন। নিঃসংকোচে বলুন। আপনি পুলিশের লোক। আপনি মানুষের মনের কথা জানেন।'

'মানুষ আশা করছে, নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে যে আওয়ামী লীগ, তার হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হবে। আর পিপিপি বিরোধী দলের আসনে বসবে।'

'তা যদি না হয়?' টিক্কা খান প্রশ্ন করলেন।

'তাহলে পাকিস্তান দুই টুকরা হয়ে যাবে।'

টিক্কা খান বললেন, 'সিলি!'

এই সভা যে আয়োজনই করা হয়েছিল আওয়ামী লীগকে ক্ষমতা না দেবার বুদ্ধি বের করার জন্য, সরদার চৌধুরী তা বুঝতে পারেননি। সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল টিক্কা খান খুবই বিরক্ত হলেন তাঁর ওপরে।

পরের দিনই তাঁকে বদলির আদেশ দিয়ে দেওয়া হলো। তাঁকে বলা হলো রাওয়ালপিন্ডিতে স্পেশাল ব্রাঞ্চে এএসপি হিসেবে যোগ দিতে।

বিদায় নেবার আগে তিনি ভাবলেন তাঁর এখানকার বস টিক্কা খানের সঙ্গে দেখা করবেন।

টিক্কা খান তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানালেন।

ভুট্টো গেছেন ঢাকায়। মুজিবের সঙ্গে কথা বলতে। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবের বাড়িতে বৈঠক শুরু হলো। খবরের কাগজে রিপোর্ট বেরোল, বৈঠক হচ্ছে আন্তরিক পরিবেশে।

ইসলামাবাদে বসে ইয়াহিয়া প্রমাদ গুনলেন। ভুট্টো আর মুজিব কি এক হয়ে যাচ্ছে। তারা দুজনে মিলে কি সিংহকে পরিণত করবে ছাগলে?

এটা হয় না। তারা যেন কোনো সমঝোতায় আসতে না পারে।

ভুট্টোর ছিল ক্ষমতার লোভ। তিনি মুজিবকে বললেন, 'আপনি প্রধানমন্ত্রী হন। আর আমার পার্টি থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষমতা দিন।'

মুজিব মৃদু হাসলেন। মনে মনে বললেন, তোমার পার্টি থেকে প্রেসিডেন্ট বানানোর ক্ষমতা দেওয়া হলে তুমিই প্রেসিডেন্ট হবে। দশ দিনের মাথায় আমাকে বরখাস্ত করবে।

মুখে বললেন, 'না, সে কী করে হয়। প্রেসিডেন্ট তো হবে অ্যাসেম্বলির ভোটে।'

'তাহলে আপনি আমাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী করুন।' ভুট্টো বললেন।

মুজিব আবারও হাসলেন। আইয়ুবের মন্ত্রিসভায় থাকার সময় ভুট্টো ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছিল। এই তীব্র ভারতবিরোধী, আমেরিকাবিরোধী লোকটা পররাষ্ট্রমন্ত্রী হওয়ার কোনো যোগ্যতাই রাখে না।

মুজিব মুখে বললেন, 'আপনাকে আমি কৃষিমন্ত্রী বানাতে পারি।'

মুজিব-ভুট্টো আলোচনায় কোনো সমাধান হয়নি। ইয়াহিয়া খানের কাছে রিপোর্ট গেল। ইয়াহিয়া খান স্বস্তি পেলেন। বললেন, আজকে রাতে পার্টি হবে। আকলিমকে খবর দাও। আজ রাতে আমি ভার্জিন চাই। বয়স্কাদের সঙ্গে থাকতে থাকতে আমার মনটাও বুড়োদের মতো হয়ে গেছে।

ইয়াহিয়া খোশ মেজাজে আছেন। তিনি তাঁর টেবিল চাপড়ে গান করছেন। তাঁর প্রিয় গান নুরজাহানের 'সাইও নি মেরা মাহিমেরে ভাগ জোয়ান আ গেয়া'।

তাঁর মনে বসন্তের হাওয়া। বাইরেও বসন্ত। তিনি অ্যাসেম্বলি আহ্বান করেছেন। ৩ মার্চ ঢাকায় বসবে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন।

এটা তিনি ডেকেছেন শুধু কথার কথা হিসেবে। এটা একটা চাল মাত্র। এরপর তিনি সেই অধিবেশন পিছিয়ে দেবেন। বাংলার মানুষ খেপে যাবে। তারা রাস্তায় নেমে আসবে। তখন তিনি তাঁর সৈন্যদের গলার শেকল খুলে দেবেন।

কিন্তু একটা হিসাবে গন্ডগোল হয়ে গেছে। শেখ মুজিব ইসলামাবাদে আসবেন না, এটাই তিনি ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু ১৯ ফেব্রুয়ারি মুজিব এখানে আসতে রাজি হয়েছেন। সর্বনাশ। মুজিব যদি রাজি হন, তাহলে

তো হবে না।

তিনি ভুট্টোকে উসকানি দিলেন, ঘেউ ঘেউ করো। সঙ্গে সঙ্গে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিল। ভুট্টো বলতে লাগলেন, 'ঢাকায় অ্যাসেম্বলি কল করেছে। কোনো পশ্চিম পাকিস্তানি সেখানে যাবে না। যে যাবে, তার ঠ্যাং ভেঙে দেওয়া হবে।'

আর ঢাকা কসাইখানা হয়ে যাবে। পশ্চিম পাকিস্তানের অ্যাসেম্বলি মেম্বারদের ঢাকায় জিম্মি বানানো হবে।

মুজিব বললেন, 'ঢাকা যদি কসাইখানা হয় পশ্চিম পাকিস্তানের পরিষদ সদস্যদের জন্য, তাহলে ইসলামাবাদও বাঙালিদের জন্য কসাইখানা হয়ে যাবে। আমি ইসলামাবাদ যাব না।'

ইয়াহিয়া খান গলায় হুইস্কি ঢেলে দিয়ে জোরে জোরে গেয়ে উঠলেন, 'সাইও নি মেরা মাহিমেরে ভাগ জোয়ান আ গেয়া'।

২২ ফেব্রুয়ারি তিনি গভর্নরদের ডাকলেন। সামরিক আইন প্রশাসকদের ডাকলেন। সব জেনারেল উপস্থিত।

সবাই বসেছেন সভাকক্ষে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এলেন।

সবাই দাঁড়ালেন। সবাইকে দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি বললেন, 'আমি ওই গোঁয়ারকে শায়েস্তা করতে যাচ্ছি।'

একজন বললেন, 'স্যার, তিনি তো এখন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। সমস্ত পাকিস্তানের জনগণের নির্বাচিত নেতা।'

'আমি তাকে বিশ্বাস করি না। আমি আমার নিজের জন্য ভীত নই। পশ্চিম পাকিস্তান আমার ভিত্তি। আমাকে এর দিকে লক্ষ রাখতে হবে।'

সবাই মনে মনে খুশি। পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো। এই অপারেশনের নাম অপারেশন ব্লিৎজ।

অপারেশন ব্লিৎজ। এটা পরিচালনা করার জন্য যা করা হবে :

ভুট্টো বলবেন, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যদি কেউ ঢাকায় অধিবেশনে যোগ দিতে যায়, তাকে হত্যা করা হবে।

প্রেসিডেন্ট ১ মার্চ ঘোষণা করবেন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকাল স্থগিত।

বাঙালিরা খেপে গিয়ে জ্বালাও-পোড়াও করবে।

তখন আবার আলোচনা শুরু করা হবে।

এরই মধ্যে কোয়েটার ৫৭ ব্রিগেড এক্স ১৬ ডিভিশন সৈন্যদের ঢাকায় রওনা করিয়ে দেওয়া হবে।

আলোচনা চলবে। আসলে সৈন্য ও অস্ত্র নিয়ে যাব পূর্ব পাকিস্তানে।

ইয়াহিয়া বললেন, 'ত্রিশ লাখ বাঙালিকে হত্যা করো। বাকিরা আমাদের হাত থেকে খাবে।' এ কথাটা রেকর্ড হয়ে থাকল। এক বছর পর রবার্ট পেইন তাঁর *ম্যাসাকার* বইয়ের (১৯৭২) ৫০ পৃষ্ঠায় এই কথা লিখবেন।

সবকিছু চলছে ইয়াহিয়ার পরিকল্পনামাফিক।

সবচেয়ে ভালো ভূমিকা পালন করছে কুকুরটা। সে ঘেউ ঘেউ করছে তারস্বরে। যে পশ্চিম পাকিস্তানি পরিষদ-সদস্য ঢাকা যাবে, তার ঠ্যাং ভেঙে ফেলা হবে।

ইয়াহিয়ার তিনটা দুশ্চিন্তা। সেনাপ্রধান হামিদ না ক্ষমতা নিয়ে নেন। তাঁর সঙ্গে আছেন পীরজাদা। তাঁদের পেছনে আছেন ভুট্টো। দুই. অ্যাডমিরাল আহসান লোকটা খুব বেশি নরম-সরম। তিনি ইয়াহিয়াকে জানাচ্ছেন, 'মুজিব আসলে মীমাংসা করতে রাজি। ছয় দফাতেও ছাড় দিতে অসুবিধা নাই। তার হাতে দুইটা সংবিধান আছে। একটা গরম, একটা নরম। প্রথমে সে গরমটা ছাড়বে, পরে ছাড়বে নরমটা।' আরে মুজিবকে কি সে চেনে? মুজিব কখনোই কথা দিয়ে কথা রাখবে না। তার আসল লক্ষ্য হলো, স্বাধীন বাংলাদেশ। পাকিস্তানে যেমন কায়েদে আজম, ভারতে যেমন মহাত্মা গান্ধী, তেমনি সে বাংলাদেশের জাতির জনক হতে চায়। তিন নম্বর দুশ্চিন্তা, তাঁর মন্ত্রিপরিষদে কতগুলো বাঙালি আছে। তারা শেষ পর্যন্ত বাঙালিই। এদের সরাতে হবে। শুধু জি ডব্লিউ চৌধুরী ছাড়া।

আর সব ঠিক আছে। সবচেয়ে ঠিক আছে আমেরিকা। আহ! আমার বন্ধু নিক্সন। আহ।

আমেরিকায় হোয়াইট হাউসের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক বিশেষজ্ঞ হ্যারল্ড স্যান্ডারস। তিনি দেখা করলেন কিসিঞ্জারের সঙ্গে। বললেন, দক্ষিণ ভারতে আরেকটা ভাগ আসন্ন। আমেরিকার উচিত রক্তপাত এড়িয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করা। 'আমরা একটা নতুন জাতির জন্ম প্রত্যক্ষ করছি, সাত কোটি

মানুষের দেশ। আমাদের এখানে কিছু করার আছে। আমরা যা করতে পারি, এটাকে শান্তিপূর্ণভাবে জন্ম দিতে পারি কিংবা পারি রক্তপাত হতে দিতে!'

কিসিঞ্জার কথাটা পাড়লেন প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে।

ঢাকার আমেরিকার কনসুলেট জেনারেল থেকে বলা হলো, পাকিস্তান আর এক থাকবে না। নতুন দেশের জন্ম হচ্ছে। আমরা তার সঙ্গে কী রকমভাবে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে পারি, সে বিষয়ে আমাদের কাজ করা উচিত।

নিক্সন বললেন, 'আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো পাকিস্তান একটা ভায়াবল দেশ হিসেবে থাকবে, সে জন্য যা করা দরকার তা করা। পাকিস্তানিরা ভালো মানুষ। শক্ত। ইয়াহিয়ার মতো মানুষেরা খুবই দায়িত্বপূর্ণ নেতা।'

ইয়াহিয়া খুবই খুশি। সবকিছু হচ্ছে তাঁর পরিকল্পনামাফিক। ভুট্টোকে লেলিয়ে দেওয়া গেছে। মুজিব পাকিস্তানে আসতে রাজি নন। পাকিস্তান থেকে সৈন্য চলে গেছে ঢাকায়। ঢাকা বিমানবন্দর গিজগিজ করছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আসা সেনায়।

সৈন্য পাঠানো হলো খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, বগুড়া, পাবনা, ময়মনসিংহ এবং টাঙ্গাইলে। দর্শনা, বেনাপোল, ঘোড়াঘাট আর ব্রাহ্মণবাড়িয়া সীমান্ত শহরে আগে থেকেই সৈন্য মোতায়েন করা ছিল।

এই অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক তাঁর সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়ে রাখলেন, অপারেশন ব্লিৎজ পরিচালিত হবে ১ মার্চের পর যেকোনো সময়ে। অল্প সময়ের নোটিশে ঝাঁপিয়ে পড়তে প্রস্তুত থাকো। সেনাবাহিনী সেই মোতাবেক প্রস্তুত রইল।

এখন শুধু দরকার এই ঘোষণা দেওয়া যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছে।

তাহলেই জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে। আর শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণাও করে দিতে পারেন। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে শুরু হবে অপারেশন ব্লিৎজ।

কিন্তু একটা হিসাব মিলছে না।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর অ্যাডমিরাল আহসান আর প্রাদেশিক সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াকুব একটা চিঠি লিখেছেন। সেটা নিয়ে তাঁরা এসেছেন ইয়াহিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। চিঠির বিষয়, তাঁরা মনে করেন, সামরিক অভিযান চালানো হবে আত্মঘাতী। কারণ তাহলে ভারত হস্তক্ষেপ করবে এবং পূর্ব পাকিস্তান চিরদিনের মতো আলাদা হয়ে যাবে।

ইয়াহিয়া তাঁদের বলেছেন, আমি আপনাদের যুক্তি মানছি। আপনারা এক কাজ করুন। ভুট্টোর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বোঝান। তিনি অধিবেশন স্থগিত করতে চাপ দিচ্ছেন।

ইয়াহিয়া এ কথা বললেন, কারণ তাঁর কাছ থেকে অধিবেশন স্থগিতের বার্তায় প্রায় জোর করেই স্বাক্ষর নিয়ে গেছেন পীরজাদা আর সেনাপ্রধান হামিদ।

আর ইয়াহিয়া এটা ভালো করেই জানেন, লারকানায় ভুট্টোর সঙ্গে হামিদও পাখি শিকার করার বিনোদনে ভালোভাবেই সময় কাটিয়েছিলেন।

আহসান আর ইয়াকুব গেলেন ভুট্টোর কাছে, তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত হবে আত্মঘাতী। তার পরিণতি হবে ভয়াবহ।

ভুট্টো বললেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া নিয়ে একদমই ভাবতে হবে না। আওয়ামী লীগ একটা বুর্জোয়া দল। এটা সাধারণ মানুষের দল নয়। এই দল গেরিলাযুদ্ধ পরিচালনা করতে পারবে না। পূর্ব পাকিস্তানে কোনো সহিংস ঘটনা ঘটবে না।'

অ্যাডমিরাল আহসান এবং জেনারেল ইয়াকুব পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এলেন।

আহসান মুজিবকে ডেকে পাঠালেন তাঁর গভর্নর হাউসে। সন্ধ্যায় মুজিব, তাজউদ্দীন, কামাল হোসেন গেলেন গভর্নর হাউসে। এ-কথা সে-

কথার পর আহসান মুজিবকে জানালেন, ভুট্টো যেহেতু তাঁর দলকে পূর্ব পাকিস্তানে আসতে দিচ্ছেন না, তাই কিছুদিনের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করা ছাড়া কোনো উপায় নাই।

মুজিব স্তম্ভিত হয়ে রইলেন।

তাজউদ্দীন বললেন, 'আমরা জানতাম, এই হবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে কোনো দিনও আমাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে না।'

মুজিব বললেন, 'নতুন তারিখ জানিয়ে দিতে হবে। তা না হলে আমি জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না।'

পয়লা মার্চে ইয়াহিয়ার লিখিত বক্তব্য রেডিও-টিভিতে পড়ে শোনানো হলো। বাংলায় তখন দুপুর একটা পাঁচ মিনিট। রেডিওতে বলা হলো, জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত।

মুহূর্তে, যেন পেট্রল ছড়ানো কাঠের স্তূপে আগুন ধরিয়ে দিল কেউ। সমস্ত বাংলাদেশ জ্বলে উঠল, ফুঁসে উঠল, গর্জে উঠল একযোগে। বাংলার সমস্ত রাজপথ পরিণত হলো মিছিলে, বাংলার সমস্ত কণ্ঠ একযোগে উচ্চারণ করতে লাগল স্লোগান: 'বাঁশের লাঠি তৈরি করো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'; 'ইয়াহিয়ার পেটে লাথি মারো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। বাংলার সমস্ত হাত মুষ্টিবদ্ধ, উত্তোলিত, বাংলার সমস্ত জোয়াল শক্ত, যেন প্রতিবাদে ফুঁসে উঠবে পদ্মা-মেঘনা-যমুনা। ক্রিকেট খেলা চলছিল ঢাকা স্টেডিয়ামে, সমস্ত গ্যালারি ঢুকে পড়ল মাঠে, খেলা স্থগিত হয়ে পড়ল, সমস্ত দর্শক যোগ দিল মিছিলে, সচিবালয় থেকে কর্মচারী-কর্মকর্তারা, মতিঝিল দিলকুশা অফিসপাড়ার সমস্ত চাকুরেরা একযোগে নেমে এল পথে। তারা চলল পূর্বাণী হোটেল অভিমুখে। সেখানে বঙ্গবন্ধু মুজিব বৈঠক করছেন এমএনএদের (জাতীয় পরিষদ সদস্য) নিয়ে। জনতা বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে ধরে তক্ষুনি স্বাধীনতা ঘোষণার দাবি জানাতে লাগল। শেখ মুজিব সাংবাদিকদের মাধ্যমে পরবর্তী ছয় দিনের জন্য বিশেষ কর্মসূচি ঘোষণা করলেন: ২ মার্চ ঢাকা শহরে, ৩ মার্চ সারা দেশে হরতাল। ৭ মার্চে রেসকোর্স ময়দানে জনসভায় চূড়ান্ত কর্মসূচি ঘোষণা।

সংবাদপত্রে পাঠানো এক বিবৃতিতে তিনি বললেন, 'সমগ্র বাংলাদেশ স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে প্রমাণ করে দিয়েছে যে, বাঙালিরা আর নির্যাতিত হতে রাজি নয়। তারা একটি স্বাধীন

দেশের নাগরিক হতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ।'

চারদিকে স্লোগান। মিছিল। প্রতিবাদ। আগুন। ব্যারিকেড। গুজব। আতঙ্ক।

গভর্নর হাউসে বসে আছেন গভর্নর অ্যাডমিরাল আহসান, প্রদেশের সিএমএলএ জেনারেল ইয়াকুব প্রমুখ। রাত দশটা। গুলিস্তান ও ওয়ারীর মধ্যবর্তী এই মিনারশোভিত গভর্নর হাউসের চারদিকে বাগান। ঝিঁঝির ডাক তাই শোনা যাচ্ছে বিশাল ঘরের ভেতরেও।

তাঁরা অপেক্ষা করছেন ইসলামাবাদ থেকে একটা ফোন কলের।

একটু আগে আহসান নতুন অ্যাসেম্বলির জন্য একটা নতুন তারিখের অনুরোধ জানিয়ে প্রেসিডেন্টকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন। পুরো প্রদেশ যে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে, তা তিনি প্রেসিডেন্টকে অবহিত করেছেন।

প্রেসিডেন্ট নতুন তারিখ কী জানান, সে জন্যই এই অধীর অপেক্ষা।

ক্রিং ক্রিং।

ফোন বেজে উঠল। ফোন ধরলেন গভর্নর আহসান। অপর পাশে জেনারেল পীরজাদা।

হ্যালো।

ফোনটা ইয়াকুবকে দিন।

জেনারেল ইয়াকুব ফোন ধরলেন।

সবাই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি ফোন রাখলে সবাই জিগ্যেস করল, কী বার্তা এসেছে।

ইয়াকুব বললেন, 'আমি এখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর।'

সবাই চুপ।

আহসান বললেন, 'চমৎকার।'

পুরো গভর্নর ভবনে নেমে এল নীরবতা।

নীরবতা ভঙ্গ করলেন আহসান। বললেন, 'গোছানোর জন্য আমি কিছু সময় নেব। আর চট্টগ্রাম যাওয়ার জন্য আমার একটা নৌযান লাগবে। আমার বইপত্র ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সেসব গুছিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি এই হাউস ছেড়ে দেব।'

ইয়াকুব কোনো কথা বললেন না। তিনি সেনানিবাসের উদ্দেশে রওনা হলেন।

সারা বাংলা অচল।

ছাত্ররা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা বানিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন চত্বরে সেই পতাকা ওড়ানো হয়েছে। সবুজ রঙের মধ্যে লাল সূর্য, তার মধ্যে পূর্ব বাংলার সোনালি মানচিত্র। ২ মার্চ রাতে বেতারে ঘোষণা আসে, কারফিউ জারি করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-জনতা-শ্রমিক নেমে আসে রাস্তায়। সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করে পুরো শহর জনতা দখল করে নেয়। ৩ মার্চ পল্টনে ছাত্র-শ্রমিক সমাবেশে শেখ মুজিব বলেন, 'হয়তো এটাই আমার শেষ ভাষণ। আমি যদি না-ও থাকি, বাঙালির স্বাধীনতার আন্দোলন যেন থেমে না থাকে। আমি মরে গেলেও মানুষ দেখবে দেশ সত্যিকারের স্বাধীন হয়েছে।'

ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের ঘোষণাপত্র পাঠ করা হয়।

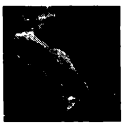

সাহেবজাদা ইয়াকুব খান বসে আছেন তাঁর ক্যান্টনমেন্টের বাসায়। রাতের খাবার খেয়ে তাঁরা বৈঠকখানায় বসেছেন। সেখানে উপস্থিত আছেন জেনারেল রাও ফরমান আলী, জেনারেল খাদিম, তাঁদের স্ত্রীরা। ইয়াকুব খানের স্ত্রী সবার নৈশভোজ তদারক করলেন।

একটু আগে তাঁরা বিদায় দিয়ে এসেছেন বিদায়ী গভর্নর আহসানকে।

আহসান মানুষ ভালো ছিলেন।

প্রেসিডেন্ট অ্যাসেম্বলির তারিখ অনির্দিষ্টকাল পিছিয়েছেন, এটা তিনি পছন্দ করেননি। তিনি প্রেসিডেন্টকে অনুরোধ করেছিলেন একটা নতুন তারিখ ঘোষণা করতে। তাই তাঁকে অপসারণ করা হয়েছে। এমনিতেই তিনি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হতেও চাননি। মানুষটা ভালো ছিলেন। সবাই তাঁকে পছন্দ করত। তাঁর বিদায়ের সময় অনেকের চোখেই ছিল অশ্রু।

তাঁকে বিদায় দিয়ে বিমানবন্দর থেকেই সবাই এসেছেন নতুন গভর্নর ও প্রদেশের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক সাহেবজাদা ইয়াকুব খানের বাসভবনে।

সাহেবজাদা ইয়াকুব খান তাঁর জীবনের গল্প খুব কম মানুষকেই বলেছেন।

তাঁদের বাবা ছিলেন রামপুরের রাজা।

তাঁরা ছিলেন দুই ভাই। বড় ভাই সাহেবজাদা ইউনুস খান। ছোট ভাই সাহেবজাদা ইয়াকুব খান। দুজনই ব্রিটিশ ভারতের সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। উভয়েই ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, উভয়েই জেনারেল সার্ভিস মেডেল পেয়েছিলেন।

১৯৪৮ সালে কাশ্মীরে দুজন সীমান্তের দুই পারে। দুজনই ব্যাটালিয়ন নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। বড় ভাই ইউনুসের ছোড়া গুলি ছোট ভাইয়ের গায়ে এসে লাগে। ইয়াকুব খান আহত হন। বড় ভাই তখন চিৎকার করে বলে ওঠেন, 'ছোট ভাই, দুঃখ করিস না, সৈনিক হিসেবে আমরা শুধু নিজেদের দায়িত্ব পালন করছি।'

এরপর ইয়াকুব কলকাতার মেয়ে তুবা খলিলিকে বিয়ে করেন। বড় ভাই তাঁকে অভিনন্দন জানান।

সেই তুবা খলিলি এখন ওই ডাইনিং টেবিলে বাসনকোসনগুলো ধুতে বেয়ারাদের নির্দেশ দিচ্ছেন।

ইয়াকুব পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি দেখছেন। পুরো দেশ চলছে মুজিবের কথায়। সারা দেশে বিদ্রোহ। বিদ্রোহ আজ বিপ্লব চারদিকে। সৈনিকেরা বাইরে বেরোতে সাহস পায় না। পথহারা সৈনিকের ট্রাকে জনতা আগুন ধরিয়ে দেয়। কারফিউ দেওয়া হয়েছে, কেউ সেই কারফিউ মানে না। আওয়ামী লীগ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। গণতন্ত্র মানলে মুজিবের হাতে ক্ষমতা দিতে হবে। অথচ প্রেসিডেন্ট চাইছেন বন্দুকের মুখে পরিস্থিতি শান্ত করতে। তা যে হওয়ার নয়, তা সবাই জানে। একটা গুলি যদি করা হয়, তখনই পাকিস্তানের মৃত্যুঘণ্টা বেজে উঠবে পূর্ব বাংলায়।

ইয়াকুব এখন গভর্নর ও সামরিক আইন প্রশাসক।

তিনি ফোন করেছিলেন প্রেসিডেন্টকে। তাঁকে ঢাকায় আসতে অনুরোধ করেছেন। বলেছেন, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে।

ক্রিং ক্রিং। ফোন বেজে উঠল।

ইয়াকুব ফোন ধরলেন।

পীরজাদা ওপাশ থেকে। 'হ্যালো, প্রেসিডেন্ট ঢাকা আসছেন না। তিনি তোমাদের বলেছেন অপারেশন ব্লিৎজ নিয়ে প্রস্তুত হতে।'

'তাহলে আমি পদত্যাগ করছি। আমি নিজের দেশের মানুষের ন্যায়সংগত আন্দোলনের ওপর গুলি চালাতে পারব না।'

ইয়াহিয়া বললেন রাও ফরমান আলীকে, 'ইয়াকুবের কোর্ট মার্শাল কবে হচ্ছে?'

রাও ফরমান আলী ছিলেন ঢাকায়। আহসানের অপসারণের খবর নিয়ে যখন টেলিফোন গিয়েছিল পিন্ডি থেকে ঢাকায়, সে সময়ও তিনি উপস্থিত ছিলেন ঢাকার গভর্নর হাউসে। আর সাহেবজাদা ইয়াকুব যখন টেলিফোনে পীরজাদাকে জানিয়ে দেন তিনি নাগরিকদের ওপর গুলি চালাতে পারবেন না, তিনিও পদত্যাগ করছেন, তখনো তিনি ছিলেন ইয়াকুবের বাসভবনেই। এরপর তিনি ছুটে গেছেন শেখ মুজিবের বাড়িতে, জানতে চেয়েছেন শেষ কোনো ভরসা আছে কি না, যাতে দুই পাকিস্তান এক থাকতে পারে।

মুজিবের ঘরের পাশে তখন একটা ছায়া নড়াচড়া করছিল।

রাও ফরমান আলী বললেন, 'কে ওখানে।'

মুজিব বললেন, 'আমার ঘরের পাশে কেউ আসতে পারে না।'

যিনি এলেন, তিনি তাজউদ্দীন।

তাজউদ্দীন বললেন, 'সমাধানের এখন একটাই পথ। ভুট্টোর সঙ্গে একই ছাদের নিচে থাকা সম্ভব নয়। বাংলাদেশে ক্ষমতা আওয়ামী লীগের হাতে দিয়ে দিন। ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা নিক।'

রাও ফরমান আলী বললেন, 'তাহলে তো আর পাকিস্তান এক থাকল না।'

রাও ফরমান আলী সোজা চলে গেলেন পিন্ডির প্রেসিডেন্ট ভবনে।

ইয়াহিয়া বসে ছিলেন বাড়ির পেছনের দিকের বারান্দায়। তাঁর সঙ্গে সেনাপ্রধান হামিদ আর ভুট্টো। তাঁদের সামনে হুইস্কির বোতল, গেলাস, বরফ। তিনজনই মদে চুর।

রাও ফরমান আলীর মনে হলো, রোম যখন পুড়ছিল, নিরো তখন বাঁশি বাজাচ্ছিল।

ফরমান বললেন, 'স্যার, আমি পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি আপনাকে বলতে এসেছি। মুজিবের সঙ্গে আমি দেখা করে এসেছি। একটু গোপন কথা আছে।'

ভুট্টো সরে গেলেন।

ফরমান বললেন, 'পরিস্থিতি ছয় দফার বাইরে চলে গেছে। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশ শাসন করবে, ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তান, তারা তা-ই চায়।'

ইয়াহিয়া মদের গেলাস তুলে নিয়ে বললেন, 'রাতে আসেন। ডিনার করেন।'

সন্ধ্যায় রাও ফরমান আলী আবার গেলেন প্রেসিডেন্ট ভবনে। জেনারেল হামিদ আর টিক্কাও ছিলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তখন ব্যস্ত, তিনি একটা বেতার ভাষণ রেকর্ড করছেন।

ইয়াহিয়া বেরিয়ে এলেন। তাঁর মুখ লাল। তিনি বললেন, ভাষণ রেকর্ড করলাম। কাল রেডিওতে শুনবেন। হামিদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'ইয়াকুবের ব্যাপারে কী করলেন? ইয়াকুবের কোর্ট মার্শাল কখন হবে?'

ইয়াহিয়ার ভাষণ প্রচারিত হলো ৬ মার্চ রাতে।

তিনি তাতে বললেন, ২৫ মার্চ অ্যাসেম্বলি বসবে।

তারপর জোরের সঙ্গে বললেন, 'পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে পাকিস্তানের অখণ্ডতা আমি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করবই। পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর কর্তব্য হলো পাকিস্তানের অখণ্ডতা, সংহতি এবং নিরাপত্তা রক্ষা করা, যা করতে তারা কখনোই ব্যর্থ হয়নি।'

বেলুচিস্তানের কসাই টিক্কা খানকে দায়িত্ব দেওয়া হলো পূর্ব পাকিস্তানের

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের।

টিক্কা খান আর রাও ফরমান আলী একই প্লেনে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। বিমানবন্দরেই তাঁরা ইয়াহিয়ার ভাষণ শুনতে পেলেন।

ভাষণটি ভুট্টোর লেখা, রাও ফরমান আলী মনে মনে বললেন।

তাঁদের প্লেন যখন ঢাকার আকাশে, তখন রেসকোর্স ময়দানে লাখ লাখ মানুষ সমবেত। আকাশ থেকে দেখা যাচ্ছে। এরা এসেছে শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের ভাষণ শুনতে।

কোকিল ডাকছে। আমের মুকুলের গন্ধ আসছে ঘরে, বয়ে নিয়ে আসছে বসন্তের বিখ্যাত সমীরণ। আমের গাছে মুকুল এসেছে নাকি! আজকাল বাতাসে কেবল বারুদের গন্ধ, টায়ার পোড়ানোর গন্ধ। এর মধ্যে হঠাৎ করে এক ঝলক বসন্ত বাতাস শেখ মুজিবের শরীরে একটু যেন শান্তির স্পর্শ বুলিয়ে দিল। তাঁর মনে হলো, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় তাঁদের বাড়ির সামনের ছোট্ট খালটার পাশে আমগাছের নিচে এমনই গন্ধ লেগে থাকত। গাছতলাটা কেমন ছেয়ে থাকত ঝরা মুকুলের দানায়।

শেখ মুজিব শুয়ে আছেন বিছানায়। ৩২ নম্বরের বিছানার দোতলায়। মাথার কাছে তাঁর বড় মেয়ে হাসু একটা মোড়া নিয়ে বসে আছেন। আর পায়ের কাছে বসেছেন বেগম মুজিব। শেখ মুজিব তাঁকে ডাকেন রেনু বলে। এই বিকেলে মুজিবের এভাবে শুয়ে থাকার কথা নয়। আজ সাতই মার্চ। ১৯৭১ সাল। রেসকোর্স ময়দান ভরে গেছে মানুষে মানুষে। প্রায় ১০ লাখ মানুষ সমবেত হয়েছে সেখানে। প্রায় সবার হাতে লাঠি। সবার মুখে স্লোগান : 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।'

স্বাধীনতা...সারাটা জীবন এই একটা লক্ষ্যই মনের মধ্যে সযত্নে লালন করে আসছেন মুজিব। সেই যখন ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হলো, শরৎ বসু

আর মুজিবের নেতা সোহরাওয়ার্দীর শেষ মুহূর্তের আসামসহ একটা অখণ্ড বাংলা গঠনের উদ্যোগ ভেস্তে গেল, আবুল হাশিমপন্থী বলে পরিচিত মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশটা খাজাদের কাছে কোণঠাসা হয়ে পড়ল, তখন শেখ মুজিব বেকার হোস্টেলের একটা কক্ষে মিলিত হয়েছিলেন মুসলিম ছাত্রলীগের সমমনা কর্মীদের সঙ্গে। সেদিনই তিনি বলেছিলেন, 'পাকিস্তান অর্জিত হচ্ছে বটে, কিন্তু আমাদের সংগ্রাম শেষ হচ্ছে না, শুরু হচ্ছে।' ঢাকায় ফিরেই তিনি শুরু করলেন মিছিল-মিটিং। ১৯৪৮ সালেই 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' বলে শুরু করে দিলেন আন্দোলন। গত ২৪টা বছর তিনি এই একটা লক্ষ্যেই কাজ করে চলেছেন। অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের সঙ্গে ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে বালুচ রেজিমেন্টের মেসেও তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন, 'আমাদের স্বাধীনতা পেতে হবে। আমাদের নিজেদের সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী থাকতে হবে।'

আজ একটা সন্ধিক্ষণে পৌঁছেছেন তিনি। গতকাল বিকেলে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ভাষণ দিয়েছেন। নিজের এই ঘরে শুয়ে রেডিওতে সেই ভাষণ তিনি শুনেছেন। সব দোষ বাঙালিদের দেওয়া হলো? দোষ আমাদের? আমাদের রক্তের দামে কেনা বুলেট আমার মানুষের ওপর বর্ষণ করা হচ্ছে, আর দোষ আমাদের?

গত রাতে আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে ভাষণ-পরবর্তী করণীয় নিয়ে বৈঠক হয়েছে।

আজ পুরো জাতি অপেক্ষা করছে তিনি রেসকোর্স ময়দানে গিয়ে কী বলবেন, তা শোনার জন্য। মানুষ একটা কথাই শুনতে চায়—স্বাধীনতা। যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশ থেকে এরই মধ্যে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই মুহূর্তে ইউডিআই, ইউনিল্যাটারাল ডিক্লারেশন অব ইনডিপেনডেন্স তিনি করুন, তারা সেটা চায় না। কাল রাতেই ইয়াহিয়া খান ফোন করেছিলেন, তিনি অনুরোধ করেছেন, এখনই যেন মুজিব চূড়ান্ত কিছু ঘোষণা না দেন। চারদিকে রব, আজ যদি তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, আজকেই পাকিস্তানি বাহিনী হামলা শুরু করবে। রক্তনদী বইয়ে দেওয়া হবে। তাঁকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে দোষ দেওয়া হবে। স্বাধীনতা ঘোষণা করলেই তো চলবে না। সেটা ধরে রাখতে হবে। ফিলিস্তিনিরা সেই কবে থেকে লড়ছে স্বাধীনতার জন্য, আইরিশরা লড়ছে, কিন্তু অর্জন

তো করতে পারছে না।

অন্যদিকে মানুষ নিজের গতিতে বিস্ফোরণের দিকে এগোচ্ছে। এই নেতৃত্ব মুজিবের নাগালের বাইরে চলে যাবে, যদি তাঁর মুখ থেকে সময়ের সংলাপ উচ্চারিত না হয়। ছাত্ররা স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা বানিয়ে ফেলেছে। তাঁর উপস্থিতিতেই সেই পতাকা ওড়ানো হয়েছে। তাঁর সারা জীবনের স্বপ্ন 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'—এই গানটা হবে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। সবকিছু ঠিক। ছাত্রনেতারা তাঁকে বারবার করে জানান দিচ্ছেন, স্বাধীনতা ঘোষণার চেয়ে কম কিছু তাঁরা শুনতে চান না।

তিন দিন আগে গুলিতে মারা গেছে ফারুক ইকবাল। আবুজর গিফারি কলেজের ছাত্র। মৌচাক-মালিবাগের মোড়ে তারা মিছিল করছিল। মুজিব শুনতে পেয়েছেন, মৃত্যুর আগে নিজের রক্ত দিয়ে এই ছাত্রটি রাজপথে লিখেছিল, 'জয় বাংলা'। মানুষ মরতে শিখেছে। এই মানুষকে কে দাবায়া রাখতে পারবে?

একটু পরে তাঁকে উঠতে হবে গাড়িতে। যেতে হবে রেসকোর্স ময়দানে। রেনু তাঁকে বললেন, 'মেলা রাত মিটিং করেছ। সারা দিন একদণ্ডও ফুরসত পাওনি। এখন একটু বিশ্রাম নাও। ১০টা মিনিট শুয়ে থাকো।'

মুজিব রেনুর কথা শুনলেন। তিনি ১০টা মিনিটের জন্যই শরীর এলিয়ে দিলেন বিছানায়। পায়ের কাছে রেনু, মাথার কাছে হাসু।

বেগম মুজিব বললেন, 'শোনো, তোমার সামনে লক্ষ মানুষ, তাদের হাতে লাঠি। তোমার পেছনে বন্দুক। এই লক্ষ মানুষ যেন হতাশ না হয়। কারও পরামর্শ শোনার দরকার নাই। তোমার বিবেকের দিকে তাকাও। তোমার মন যা বলবে, তা-ই বলবা।'

মুজিব যেন কোত্থেকে শক্তি পেলেন। তাঁর মন যা বলবে, তা-ই তিনি বলবেন।

তিনি উঠে পড়লেন। বেগম মুজিব তাঁকে এগিয়ে দিলেন তাঁর সাদা পাঞ্জাবি, তাঁর কালো হাতাকাটা কোট।

বঙ্গবন্ধু মুজিব রওনা হলেন। নিরাপত্তার জন্য ৩২ নম্বর থেকে সরাসরি মিরপুর রোডে না উঠে পশ্চিম দিক দিয়ে রওনা হলো গাড়ি।

শেখ মুজিব চলেছেন। পথে মানুষ আর মানুষ। হাতে লাঠি, লগি। তাদের এক দফা : স্বাধীনতা। মানুষের ভিড় ঠেলে সভামঞ্চে পৌঁছাতে দেরি হয়ে যায়। নৌকা আকৃতির মঞ্চ। এখন যেখানে শিশুপার্ক, তার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ছিল সেই মঞ্চটি।

রোদ মরে আসছে। ফাল্গুনের বাতাস স্তব্ধ হয়ে আছে মুজিব কী বলেন, তা শোনার জন্য। উৎকর্ণ হয়ে আছে সমবেত ১০ লাখ মানুষ। তাঁর সঙ্গে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি। ২৪টা বছর যে মানুষটা সাহস, প্রতিজ্ঞা, দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ দিয়ে হয়ে উঠেছেন সব বাঙালির একমাত্র কণ্ঠস্বর, এবার তিনি মুখ খুলবেন।

তিনি মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ালেন। একটা সবুজ হেলিকপ্টার সেনাবাহিনীর উপস্থিতি জানান দিতে উড়ছিল রেসকোর্সের ওপর দিয়ে।

মুজিব জনতাকে অভিবাদন জানিয়ে মুখ খুললেন :

'ভাইয়েরা আমার,

'আজ দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন, আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।

'কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পরে বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে, আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং এ দেশকে আমরা গড়ে তুলব। এ দেশের মানুষ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, ২৩ বছরের করুণ ইতিহাস বাংলার অত্যাচারের, বাংলার মানুষের রক্তের ইতিহাস। ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস।'

রেসকোর্সে সমবেত নিযুত মানুষ তাদের সামনে দেখতে পান আয়না, ইতিহাসের আয়না। ২৩ বছরে এ বদ্বীপের ইতিহাসে কী কী ঘটেছে, যেন মুহূর্তেই সিনেমার ছবির মতো তাদের সামনে ভেসে ওঠে—

'১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি, ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও

আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল জারি করে দশ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছে। ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনে, ৭ জুন আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকারের দায়িত্বভার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন; আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দিন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে, মার্চ মাসে (সভা) হবে। আমরা বললাম, ঠিক আছে, আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসব। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলির মধ্যে আলোচনা করব। এমনকি আমি এ পর্যন্ত বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।

'ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরও আলোচনা হবে। তারপরে অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ করলাম, আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈয়ার করি। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেম্বলি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেওয়া হবে। যদি কেউ অ্যাসেম্বলিতে আসে, তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেম্বলি চলবে। তারপর হঠাৎ ১ তারিখে অ্যাসেম্বলি বন্ধ করে দেওয়া হলো।

'ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসেবে অ্যাসেম্বলি ডেকেছিলেন, আমি বললাম যে, আমি যাব। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। পঁয়ত্রিশ জন সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে আসলেন। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হলো। দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। বন্ধ করে দেওয়ার পর এ দেশের মানুষ

প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

'আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করেন। আমি বললাম, আপনারা কলকারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপন ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। তারা শান্তিপূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

'কী পেলাম আমরা? যে আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী-নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে। তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। [...]

'ভাইয়েরা আমার!

'২৫ তারিখে অ্যাসেম্বলি কল করেছে। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে বলে দিয়েছি যে, ওই শহীদের রক্তের ওপর পাড়া দিয়ে আরটিসিতে কিছুতেই মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেম্বলি কল করেছে, আমার দাবি মানতে হবে প্রথম। সামরিক আইন, মার্শাল ল উইথড্র করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত নিতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তার পরই বিবেচনা করে দেখব আমরা অ্যাসেম্বলিতে বসতে পারব কি পারব না। এর আগে অ্যাসেম্বলিতে বসতে আমরা পারি না।

'আমি, আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমরা এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দিবার চাই যে, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট, কাছারি, আদালত, ফৌজদারি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে, সে জন্য সমস্ত অন্য জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি চলবে, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে। শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তরগুলো ওয়াপদা, কোনো কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এর পরে যদি বেতন দেওয়া না

হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোককে হত্যা করা হয়, তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলো। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছু আমি যদি হুকুম দেবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব। আমরা পানিতে মারব।

'তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না।

'কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। সাত কোটি মানুষকে দাবায়া রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।

...

'সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এ দেশের মুক্তি না হবে, খাজনা, ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো, কেউ দেবেন না। শোনেন—মনে রাখবেন শত্রু বাহিনী ঢুকেছে। নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু মুসলমান, বাঙালি নন-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা, যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে, তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশন আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। দুই ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনাপত্র নেবার পারে। কিন্তু পূর্ব বাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ব বাংলায় চলবে এবং বিদেশের সঙ্গে নিউজ পাঠাতে হলে আপনারা চালাবেন।

'কিন্তু যদি এ দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায়, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোলো এবং তোমাদের যা কিছু আছে তা-ই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, এ দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশা আল্লাহ।'

তিনি তার তর্জনী তুলে ধরলেন নক্ষত্রের দিকে, বাংলার মানুষ দেখতে পেল দীর্ঘদেহী শেখ মুজিবের হাত বড় হতে হতে আকাশ ছুঁল, রচনা করল পথনির্দেশক এক নতুন সপ্তর্ষিমণ্ডল, তিনি কণ্ঠে জোর এনে, চিবুকে প্রত্যয় ফুটিয়ে, চোখে বজ্রের শক্তি এনে ঘোষণা করলেন—

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।'

প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তুলতে হবে, যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে, বাংলাদেশের কোনায় কোনায় পৌঁছে গেল এই বার্তা। সেনাছাউনিগুলোয় বাঙালি সৈনিকেরা, পুলিশ ব্যারাকে বাঙালি পুলিশেরা, ইপিআর ছাউনিতে ইপিআর জোয়ানরাও চোখে চোখে পরস্পরের সঙ্গে সেরে নিতে লাগল বার্তা-বিনিময়। তারা এখন জানে, কখন কী করতে হবে। একটা গুলি যদি চলে, আর একটা গুলি যদি চলে...

হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুম। নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জার পাকিস্তানের ঘটনায় আমেরিকার করণীয় নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের সভা ডেকেছেন। তাতে যোগ দিয়েছেন পররাষ্ট্র দপ্তরের প্রতিনিধিরা, পেন্টাগন এবং সিআইএর উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা বললেন, পূর্ব পাকিস্তানে ২০ হাজার সৈন্য আছে। ১২ হাজার কমব্যাট। পূর্ব পাকিস্তানের লোকসংখ্যা সাড়ে সাত কোটি। ফলটা হবে রক্তস্নান। পূর্ব পাকিস্তানের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার কোনো আশাই তাদের নাই।

আরেকজন কর্মকর্তা বললেন, সত্যিকারের রক্তস্নান, আরেকটা বায়াফ্রা হবে।

কিসিঞ্জার বললেন, 'আমরা কেন শক্তি প্রয়োগে নিষেধ করব।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ইয়াহিয়ার সম্পর্ক ভালো। আমরা বন্ধু হিসেবে তাঁকে শক্তি প্রয়োগ না করতে বলতে পারি, কিন্তু তাঁর দেশ ভাগ হয়ে যাচ্ছে, আমাদের এই বার্তাকে কেন তিনি ভালোভাবে নেবেন। এই আবেগপ্রবণ পরিস্থিতিতে আমরা আমাদের রাষ্ট্রদূতকে তাঁর কাছে পাঠাতে পারি, কিন্তু তাতে কী লাভ? তিনি তো আমাদের কথা শুনবেনও না।'

কাজেই কিসিঞ্জার ঠিক করলেন, আমেরিকার নীতি হবে কোনো কিছু না করা। চুপ করে থাকা।

তিনি প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে তা-ই লিখলেন, 'ইয়াহিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে তিনি শক্তি প্রয়োগ করবেন। আর শেখ মুজিবুর রহমান গান্ধী কায়দায় অহিংস অসহযোগ শুরু করেছেন, যার ওপরে শক্তিপ্রয়োগ করার যুক্তি পাওয়া যাবে না। এই অবস্থায় পশ্চিম পাকিস্তানের এই সামরিক শক্তি নাই যে তারা দীর্ঘস্থায়ী কোনো বিদ্রোহ দমন করতে পারবে।

'কাজেই আমাদের কিছু করতে যাওয়া ঠিক হবে না, যাতে পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নষ্ট হয়। আমরা রক্ষণাত্মক অবস্থান নেব, যেন মনে না হয় আমরা পাকিস্তানের ভাগ হওয়াকে উৎসাহিত করছি।'

শামীমকে তিনি ডেকে এনেছেন তাঁর রাষ্ট্রপতি ভবনে।

শামীম হাত দেখতে জানেন। হাতের রেখা দেখে বলে দিতে পারেন ভবিষ্যৎ।

শামীমের সামনে তিনি হাত মেলে ধরে আছেন।

ইয়াহিয়া সোফায় বসা। শামীম বসেছেন তার হাতলে।

তিনি ইয়াহিয়ার হাতের তালু মেলে ধরেছেন। শিরোরেখা দুই ভাগ হয়ে গেছে। হৃদয়রেখা বেশ বড়।

শামীম পরেছেন সালোয়ার-কামিজ। তাঁর ওড়না ইয়াহিয়ার উরুর ওপরে খসখস করছে।

শামীমের গায়ের গন্ধটা বুনো। ইয়াহিয়া এই গন্ধ পছন্দ করেন।

শামীম ইয়াহিয়ার ডান হাতের বুড়ো আঙুল টিপছেন।

ইয়াহিয়া বললেন, 'হাত দেখতে আঙুল টিপতে হয় নাকি?'

শামীম বললেন, 'হ্যাঁ। এটা কিরোর বইয়ের নির্দেশ। কারো আঙুল যদি শিথিল হয়, তাহলে সেই মানুষওটাও শিথিল।'

'আমার আঙুল শিথিল হতে পারে, কিন্তু আমার কলম শক্ত। হাকিম নড়বে, কিন্তু হুকুম নড়বে না।'

'এ কথার মানে কী?' শামীম দুষ্টু হাসি দেন।

'আমি লিখিত নির্দেশ দিয়ে দিয়েছি। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করতে সেনাবাহিনী অভিযান চালাবে। ভুট্টো সে সময় আমার পাশে ছিল। সে বলেছে, "জেনারেল, আপনি পাকিস্তান রক্ষা করলেন।"'

শামীম বললেন, 'বাংলায় একটা কথা আছে। নারী চায় না তখত, নারী চায় না ভক্ত, নারী চায় তার মরদ হবে লোহার মতো শক্ত।' বলেই শামীম হাসতে লাগলেন।

ইয়াহিয়া মদের গেলাসে চুমুক দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা বলো, কোন তারিখে আমি হারামজাদা বাঙালি মশাগুলোর বিরুদ্ধে অ্যাকশন শুরু করব।'

শামীম হাতের লেখা ভালোভাবে দেখতে লাগলেন। হাতে এই সব কথা লেখা থাকে না। কিরোর বইয়ে শিরোরেখা, হৃদয়রেখা, আয়ুরেখা আছে। এমনকি কয়টা বিয়েও আছে। কিন্তু কয় তারিখে কী হবে এসব নিয়ে কোনো কথাই লেখা নাই। এসব বিষয় নিয়ে বলতে হয় সাধারণ জ্ঞান থেকে।

শামীম বললেন, '২৫ মার্চ আপনার জন্য সবচেয়ে শুভ দিন। এই দিন, দুই বছর আগে, আপনি ক্ষমতা নিয়েছিলেন। ২৫ মার্চ।'

'তাহলে ২৫ মার্চ আমি সামরিক অভিযান শুরু করছি।'

'তাই হবে সবচেয়ে ভালো। ২৫ মানে ৭। শুভ সংখ্যা।'

'হু। শুভ সংখ্যা।'

'তাহলে এর আগে কী করব?'

'সময় নিন।'

'হ্যাঁ, সময় নেব। অস্ত্র পাঠাব। সৈন্য পাঠাব। আর পৃথিবীর মানুষকে দেখাতে হবে যে আমরা চেষ্টা করেছি। তাই আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে। আর তুমি জানো, বাঙালি মেয়েদের আমি পছন্দ করি।'

'আপনি আমার চেয়েও কাউকে বেশি পছন্দ করেন, তা আমি চাই না।'

'তোমরা মেয়েরা কেন যে একজন আরেকজনকে এত অপছন্দ করো। আর পছন্দের পুরুষটাকে তোমরা সব সময় কেন যে দখল করে রাখতে চাও?'

'আর আপনারা পুরুষেরা যে দেশকে দখল করে রাখতে চান।'

'এটা ঠিক দখল নয়। পাকিস্তান ভাগ হয়ে যাচ্ছে, তাতে আমি সভাপতিত্ব করতে পারি না।'

'অনেক হাত দেখেছ। এখন বসো। কার্পেটে বসো।'

পিআইএর বিশেষ বিমানে উঠেছেন ইয়াহিয়া। সঙ্গে নিয়েছেন ফিরদৌসকে।

ফিরদৌসকে নেবার কারণ সে লাস্যময়ী। তাকে দেখলেই উথালপাতাল করে দেহমন। তার মুখটা বেশ বড়। তার কোমর চিকন, নিতম্ব বড়, হাত-পাগুলোও বেশ শক্তপোক্ত। সে লম্বা-চওড়া, গোলাপি তার গায়ের রং। স্তন দুটো অস্বাভাবিক রকমের বড়। কিন্তু বিশেষ গুণ হলো, সে ইয়াহিয়াকে দখল করে রাখতে চায় না। পার্টির যেকোনো অতিথির সঙ্গেই সে চলে যেতে প্রস্তুত হয়ে আছে।

ইয়াহিয়া যাচ্ছেন ঢাকায়। শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করতে। আলোচনা তো আসলে হবে কচু। সময় কাটানোই আসল লক্ষ্য। এই সময় তিনি কিছুটা সময় দেবেন ফিরদৌসকে। কিছুটা সময় দেবেন আলোচনায়।

বাকি সময়টা দেবেন বাঙালি পার্টি-নারীদের। আর ফিরদৌসও পাকিস্তানি জেনারেলদের মনোরঞ্জন করতে পারবে। ওখানে তাঁরা খুব চাপের মুখে আছেন। তাঁদেরও তো আনন্দ-ফুর্তি দরকার।

প্লেন সরাসরি ঢাকা যেতে পারে না। প্রথমে যায় কলম্বো। ভারতের এক প্লেন দুজন কাশ্মীরি জঙ্গি ছিনতাই করে এনেছিল লাহোর এয়ারপোর্টে। যাত্রীদের তারা ছেড়ে দেয়। তারা বিমান থেকে নেমে পড়লে সেই বিমান উড়িয়ে দেওয়া হয়। ভুট্টো গিয়ে সেই দুই কাশ্মীরি জঙ্গির সঙ্গে হ্যান্ডশেক করেন।

ভারত খুব খেপে যায়। তারা ভারতের আকাশ পাকিস্তানি বিমানের জন্য নিষিদ্ধ করে। এখন পাকিস্তান থেকে বিমান প্রথমে যায় কলম্বো। তারপর সেখান থেকে যায় ঢাকায়। অনেক ঘুরতে হয়। আগে এক বোতল হুইস্কিতেই পিন্ডি থেকে ঢাকা যাওয়া যেত। এখন লাগে আড়াই বোতল। কোনো মানে হয়?

ঢাকায় ইয়াহিয়ার সঙ্গে মুজিবের আলোচনা চলছে। ইয়াহিয়া জানেন, এ সবই প্রহসন। কিন্তু কাগজে ছাপা হলো, ইয়াহিয়া আর মুজিব সমঝোতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন।

সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টোর মাথা গরম হয়ে গেল।

ভুট্টোকে ফোন করেছেন তাঁর ঢাকার বান্ধবী হুসনা শেখ।

হুসনা শেখ, আবুল আহাদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী। তাঁর বাবা বাঙালি, মা মারোয়ারি। আইয়ুব খানের মন্ত্রী হিসেবে যখন ভুট্টো ঢাকায় এসেছিলেন ষাটের দশকে, তখন হুসনার সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তাঁর চোখে বাঙালি মায়া, তাঁর গায়ের রং মায়ের তরফে পাওয়া দুধে-আলতা, তাঁর ব্যক্তিত্ব অপরূপ। ভুট্টোর জীবনে কত নারী এসেছে, গেছে, কিন্তু কেউ তাঁর অশান্ত ব্যক্তিত্বকে একটুখানি শান্তির স্পর্শ দিতে পারেনি, যা পারেন হুসনা। দুই সন্তানের জননী হয়েও তিনি যে পারঙ্গমতা দেখান, তা কেবল তিনি কামকলা নিপুণা বলে নেন, বুদ্ধিবৃত্তিক গভীরতা ধারণ করেন বলে।

সেই ষাটের দশকের শুরু থেকে ভুট্টোর সঙ্গে প্রেম হুসনার।

হুসনা ফোন করলেন ভুট্টোকে, 'ইয়াহিয়া-মুজিব সমঝোতা হয়ে যাচ্ছে। আর তুমি কী করছ?'

ভুট্টো ছুটে এলেন ঢাকায়।

ভুট্টোকে ছাড়া কোনো সমঝোতা হতেই পারে না। যা-ই হোক না কেন, পাকিস্তানে ভুট্টোই হবেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেই দিয়েছেন, 'হাম ইধার তুম উধার।'

ভুট্টোর আগমনে ইয়াহিয়া খুশিই হলেন।

ভুট্টোর সঙ্গে আলোচনা করতে মুজিব রাজি ছিলেন না। ইয়াহিয়ার পীড়াপীড়িতে রাজি হলেন।

তাজউদ্দীন বললেন, আর কোনো কিছু নিয়ে আলোচনা করতে হবে না। পশ্চিমে ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হবেন। বাংলাদেশে শেখ মুজিব।

ইয়াহিয়া জানেন, আর মাত্র কদিন পরেই ২৫ মার্চ। ওই রাতেই অভিযান।

ভুট্টো বললেন, এর মানে তো পাকিস্তান দুই ভাগ হয়েই গেল।

মুজিব ও তাজউদ্দীন এখন তা-ই চান। বস্তুত তাঁরা এরই মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা কার্যকর করে ফেলেছেন। প্রতিটা অফিস আদালত পুলিশ সচিবালয় চলছে তাঁর নির্দেশে।

প্রতিদিন আওয়ামী লীগ অফিস থেকে নির্দেশনামা যায়, সরকারি কোন দপ্তর কীভাবে চলবে। সেভাবেই সবকিছু চলে পূর্ব পাকিস্তানে।

ভুট্টো মিলিত হলেন হুসনার সঙ্গে।

তাঁর কোলে মাথা রেখে বললেন, 'পাকিস্তান ভাগ হয়েই গেছে। পশ্চিমে আমিই প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু এটাতে রাজি হওয়ার কথা আমি বলব না। কারণ তখন সবাই বলবে, আমি পাকিস্তান ভেঙেছি। আলোচনা চলতে থাকুক। ঘটনা কী ঘটবে, আমরা জানি। আমার বন্ধু পীরজাদা, হামিদ মিলে আমরা ঠিক করে রেখেছি। প্রেসিডেন্ট লিখিত অর্ডার আমার সামনে দিয়েছেন। টিক্কা খানকে আনা হয়েছে সে জন্যই। মানুষ মারতে তার কোনো জুড়ি নাই।'

হুসনা বললেন, 'বাংলাদেশ আলাদা হয়ে গেলে আমি করাচি চলে যাব।'

'অবশ্যই। আমি তোমাকে ছাড়া পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে কী করব। তোমাকে করাচি নিয়ে যাব। সুন্দর একা ভিলা বানিয়ে দেব। তুমি সেখানে থাকবে। আমি মাঝেমধ্যে যাব।'

'মাঝেমধ্যে যাবে? তুমি আমার সঙ্গেই থাকবে।'

'আমি তোমার সঙ্গে থাকব। আমরা কথা বলব। চীনের সঙ্গে আমাদের

সম্পর্ক নিয়ে। কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে। আর্ট নিয়ে। কবিতা নিয়ে।'

হুসনা ভুট্টোর চুলে বিলি কেটে দেন। তাঁর ঠোঁটে চুমু দেন। কিন্তু ভুট্টো উঠে বসেন।

তাঁর কী যেন মনে পড়েছে। খুবই অস্থির প্রকৃতির একটা মানুষ। এমন চঞ্চলও মানুষ হয়!

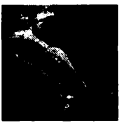

জেনারেল খাদিম হোসেন রাজা এবং রাও ফরমান আলী খান অপারেশন সার্চলাইটের বিশদ পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন। ট্যাংক বেরোবে, কামান বেরোবে, ভারী অস্ত্রশস্ত্র বেরোবে।

খাদিম রাজা ও রাও ফরমান আলী এর আগেই তাঁদের সন্তান ও কাজের লোককে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। কারণ, তাঁরা জানেন কী হতে যাচ্ছে। কিন্তু অন্য কারও তা জানার কথা নয়। পুরো ব্যাপারটা গোপন।

কিন্তু একজন জেনে গেলেন। তাঁর নাম কালাচান্দ। পুরান ঢাকার এক হিন্দু স্বর্ণ ব্যবসায়ী। তিনি হাত দেখে ভবিষ্যৎ বলতে পারেন। খাদিম রাজা তাঁকে বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি এর আগেও সেনা কর্মকর্তাদের হাত দেখেছেন। সবাই বলে তাঁর গণনা নির্ভুল হয়। খাদিম রাজার হাত দেখে কালাচান্দ বলেছেন, 'আপনি জুনের মধ্যে আপনার কাজ শেষ করে পশ্চিম পাকিস্তান চলে যাবেন।' রাও ফরমান আলীর হাত দেখে তিনি বলেছিলেন, 'আপনি আরও অনেক দিন থাকবেন।'

রাও ফরমান আলী বলেন, 'প্রেসিডেন্ট এরই মধ্যে আমাকে চলে যেতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমি ঢাকা ছাড়ছি।'

কালাচান্দ আরও মনোযোগ দিয়ে হাত দেখে বলেন, 'তা হওয়ার নয়।'

শেষ পর্যন্ত তা-ই হয়। রাও ফরমান আলী থেকে যান ঢাকায়।

এখন এই মুহূর্তে কালাচান্দ এসেছেন খাদিমের বাড়িতে। তিনি থরথর করে কাঁপছেন। বলছেন, 'এর আগে ঢাকায় যত রায়ট হয়েছে, আর্মি অফিসাররা, জিওসিরা আমাকে আর আমার পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছেন। আমি খুব খারাপ ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছি। আজ রাতেই ভয়াবহ ঘটনা শুরু হবে।'

সন্ধ্যা সাতটা বাজে। ২৫ মার্চ ১৯৭১। কালাচান্দ জানলেন কী করে, আজ রাতেই পাকিস্তান সৈন্যবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়বে বাঙালিদের ওপরে। প্রথমেই বিশাল একটা শক দিতে হবে। প্রথম চোটেই সবকিছু স্তব্ধ করে দিতে হবে।

ইয়াহিয়া তাঁর গাড়িবহর নিয়ে, পতাকা, গার্ড, প্রটোকল নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে ঢুকলেন। একটু পরে তাঁর পতাকাশোভিত গাড়ি, পুরো প্রটোকল-সমেত গাড়িবহর ফিরে গেল প্রেসিডেন্ট ভবনে।

কিন্তু তিনি রয়ে গেলেন ক্যান্টনমেন্টে।

প্রেসিডেন্ট চোরের মতো চুপি চুপি গেলেন তেজগাঁও এয়ারপোর্টে। উঠে পড়লেন প্লেনে। তাঁর সঙ্গে রইল পিন্ডি থেকে আনা ফিরদৌস।

এয়ারপোর্টে কর্মরত বাঙালি অফিসাররা দেখে ফেললেন প্রেসিডেন্টকে।

সঙ্গে সঙ্গে খবর চলে গেল শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে। প্রেসিডেন্ট পালিয়ে যাচ্ছেন।

খাদিম অস্থির। টিক্কা খান তাঁকে বলে দিয়েছেন, আজই সেই রাত। 'শোনো, আমি বাংলার মানুষ চাই না, মাটি চাই।'

রাও ফরমান আলী কিংবা খাদিম হোসেন রাজা যদি মানুষ মারতে দ্বিধা করেন, টিক্কা খান আনিয়েছেন আরও নিষ্ঠুর দুজন অফিসারকে, জেনারেল মিঠা খান আর খুদাদাদ খানকে।

সবকিছু করা হচ্ছে চরম গোপনীয়তায়। কিন্তু কালাচান্দ জানলেন কী করে?

তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী করার ক্ষমতা দিয়ে?

খাদিম ও রাও ফরমান আলী গেলেন গ্যারিসন সিনেমা হলে। সঙ্গে তাঁদের স্ত্রীরা। হলভর্তি সৈনিক ছবি দেখছে। সবকিছু ঠিক আছে।

বিরতির সময় লাইট জ্বালানো হলো। দেখা গেল, বাঙালি সৈনিকেরা

কেউ নাই। তারা জেনে গেছে, প্রেসিডেন্ট পালিয়েছেন। আজ রাতই সেই প্রলয়ের রাত।

খাদিমের বাড়িতে একটা ময়না ছিল।

সিলেট থেকে ময়নাটা আনা হয়েছিল। এটা ছিল তাঁর মেয়ে রুবিনার প্রিয় সঙ্গী। রুবিনা এখন লাহোরে।

এদিকে শেখ মুজিবকেও তাঁরা সাংকেতিক নাম দিয়েছেন 'ময়না'।

২৫ মার্চ রাতে ইয়াহিয়া খানের প্লেন পাকিস্তানের আকাশে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হলো, মুভ।

ট্যাংক কামান রিকোয়েললেস রাইফেল নিয়ে আর্মি শকট চলল জনপদের দিকে।

গোলাবর্ষণ শুরু হলো। মনে হলো, কেয়ামত হচ্ছে, আকাশ ভেঙে পড়ছে।

কামানের গোলা ট্যাংকের গোলার শব্দে মারা গেল ময়না পাখিটা।

খাদিম রাজা লাহোরে ফোন করেন। 'আম্মা রুবিনা, ময়না পাখিটা মারা গেছে।'

রুবিনা ভাবল, শেখ মুজিব মারা গেছেন। সারা লাহোরে ছড়িয়ে পড়ল এই গুজব যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হয়েছে।

প্রেসিডেন্ট পুরো দুই বোতল হুইস্কি শেষ করেন ছয় ঘণ্টার ফ্লাইটে। তারপর তিনি ঘুমিয়ে পড়েন ফিরদৌসের কোলে।

বিমান করাচিতে অবতরণ করল। প্রেসিডেন্টকে নামানো হলো পাঁজাকোলা করে। তার ঘুম ভেঙে গেল।

পরের দিন সকালবেলা তাঁকে রেডিও-টিভিতে ভাষণ দিতে হবে।

তাঁর পা থরথর করে কাঁপছে।

রাত এগারোটা। ধানমন্ডি লেকের ধারের গাছগুলোয় জোনাকিগুলো মিটমিট করে জ্বলছে। ৩২ নম্বরের খোলা ছাদ থেকে শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝির ডাক। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া কমে আসছে। স্তব্ধ হয়ে আসছে চারপাশ। হঠাৎ হঠাৎ শোনা যাচ্ছে কুকুরের ডাক। কোন দূর থেকে ভেসে আসছে জয় বাংলা স্লোগান। রাস্তায় লোকজন তখনো ব্যারিকেড দিচ্ছে।

শেখ হাসিনা আর ওয়াজেদ মিয়া ৩২ নম্বর বাড়ির ছাদে অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন। তাঁদের রাস্তার মৃদু আলোতেও দেখা যাচ্ছে, তাঁদের মুখে শঙ্কার রেখা।

শেখ কামাল গিয়েছিলেন রাস্তায় ব্যারিকেড দিতে। কামাল ভাই কি ফিরেছেন? শেখ হাসিনা ভাবলেন।

নিচে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন নেতা-কর্মীরা। ভিড় লেগেই আছে। তবে আজ আছে অজানা আতঙ্ক। নানা রকমের খবর আসছে বিভিন্ন জায়গা থেকে।

'তোদের আব্বার খেতে দেরি হবে।' হাসিনাকে বললেন রেনু। তোরা সবাই খেয়ে নে।

'আব্বাকে ছাড়া খাব?' হাসিনা বললেন।

'হ্যাঁ। তোর আব্বার দেরি হবে।'

রেনু টেবিলে খাবার দিতে বললেন। ওয়াজেদ মিয়া, শেখ হাসিনা, রেহানা, শেখ কামাল, জামাল আর ছোট্ট রাসেল রাত নয়টার দিকে খেতে বসলেন। নিয়ম ভঙ্গ হলো। রাতে শেখ মুজিবসহ সবাই একসাথে খাবেন, এটাই নিয়ম।

শেখ কামাল ছিলেন মগবাজার এলাকায়। ব্যারিকেড দিচ্ছিলেন। তিনিও তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বললেন, 'আমি আসি।'

এই আসার কোনো একটা মানে আছে। আজ রাতে মিলিটারি আক্রমণ করতে পারে এই বাড়িতে, এই রকম খবরই আসছে।

বাড়ির পেছনে জাপানি কনসুলেটের বাড়ি। সেখানেই কি গেলেন কামাল? নাকি চলে গেলেন আরও দূরে? ওয়াজেদ মিয়া তোয়ালে দিয়ে হাত মুছতে মুছতে ভাবলেন।

তারপর হাসিনাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন ছাদে। আজ দুজনের কেউই ছাদে বসতে পারছেন না। অস্থিরভাবে পায়চারি করছেন।

সেখান থেকে তাঁরা নামলেন দোতলায়।

'আব্বা এখনো নিচে? আব্বা খাবে না।' শেখ হাসিনা বললেন ওয়াজেদ মিয়াকে। 'আব্বা বিকেল থেকে কিছুই খায়নি। এখন বাজে ১১টা। কখন খাবেন? চলো তো নিচে গিয়ে আব্বাকে ডেকে আনি।'

হাসিনা ও ওয়াজেদ মিয়া দোতলা থেকে নিচে নামলেন। বঙ্গবন্ধু তখন আ স ম আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজ—দুই ছাত্রনেতার সঙ্গে কথা বলছেন।

তাঁরা কথা বলে দ্রুত পায়ে চলে গেলেন।

শেখ মুজিব জড়িয়ে ধরলেন তাঁর বড় মেয়ে হাসিনাকে। বঙ্গবন্ধুর চোখ টকটকে লাল—ওয়াজেদ মিয়া দেখতে পেলেন হলুদ আলোয়। মুজিব বললেন, 'মা, সারা দিন তোকে দেখি না।'

মুজিবকে ধরে নিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসালেন হাসিনা। রেনু তাঁর প্লেটে ভাত বেড়ে দিতে লাগলেন। মুজিব ভাত খাচ্ছিলেন অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে। রেহানা এসে তাঁর পাশ ঘেঁষে দাঁড়ালেন।

এই সময় নিচ থেকে একজন পরিচারক এসে খবর দিলেন, ঝন্টু নামের একজন দেখা করতে চায়। খুব নাকি জরুরি।

মুজিব বললেন, 'আমি ওর কথাই ভাবছিলাম। ওয়াজেদ, যাও তো ওকে নিয়ে এসো ওপরে।'

ওয়াজেদ নিচে গেলেন, 'আপনি?'

'আমি ঝন্টু। লন্ডনের আওয়ামী লীগ নেতা জাকারিয়া চৌধুরীর ছোট ভাই।'

ওয়াজেদ মিয়া বঙ্গবন্ধুর দেহরক্ষী মহিউদ্দিনকে বললেন, 'চলেন, এনাকে নিয়ে ওপরে যাই।'

ঝন্টু ওপরে এলেন। 'কী খবর ঝন্টু?' মুজিব বললেন।

ঝন্টু সোজা গিয়ে মুজিবকে জড়িয়ে ধরলেন। 'মুজিব ভাই। পাকিস্তানি

আর্মিরা আপনাকে মারতে আসছে। আপনি এক্ষুনি বাসা থেকে চলে যান। তারা ট্যাংক, কামান, মর্টার, রিকোয়েললেস রাইফেল নিয়ে বের হচ্ছে। সব প্রস্তুত।'

'তাদের প্ল্যানটা কী?'

ঝন্টু বললেন, 'তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল, জগন্নাথ হল, রাজারবাগ পুলিশ হেডকোয়ার্টার, পিলখানা অ্যাটাক করবে। রেডিও, টেলিভিশন, টেলিকমিউনিকেশন সেন্টার দখল করবে। ফুড গোডাউন দখল নেবে।'

মুজিব চিৎকার করে বললেন, 'ওয়াজেদ, তুমি হাসিনা, রেহানা, জেলিকে নিয়ে আমাদের ভাড়া করা বাসাটাতে চলে যাও। জামাল আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। ও থাকুক। রেনু থাকো। বাকিরা চলে যাও। কামাল তো গেছে, না?'

হাসিনা আর রেহানা তাঁদের আব্বাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন।

রেনু বললেন, 'ওয়াজেদ, তুমি সুটকেস নিয়ে চলে যাও। হাসিনা-রেহানাকে আমি গুছিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি পাগলাকে দিয়ে।'

ওই বাড়ির গৃহপরিচারক ওয়াহিদুর রহমানকে পাগলা নামে ডাকা হতো।

ওয়াজেদ সাহেব বঙ্গবন্ধুকে বললেন, 'ইয়াহিয়া এখন কোথায়?'

মুজিব বললেন, 'বিকেল পাঁচটার দিকে ক্যান্টনমেন্টে চলে গেছেন। রাষ্ট্রপতি ভবনে আর নাই।'

'আপনি কী করবেন? আপনাকে তো ওরা মেরে ফেলতে পারে?'

মুজিব বললেন, 'আমার চলে যাওয়ার উপায় নাই। আমি গেলে ওরা পুরা বাংলাদেশ পুড়িয়ে দেবে। আমাকে মারতে চাইলে ওদের এই বাসাতেই মারতে হবে।'

রেনু বললেন, 'থাকো। যা হওয়ার হবে।'

রেনু মাত্র দুই দিন আগে ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে নিজের ভাতের থালায় পানি ঢেলে দিয়েছিলেন। ভাত খাননি। মুজিব যথারীতি তাঁর সঙ্গে খেতে বসেছিলেন।

রেনু জিগ্যেস করেছিলেন, 'ইয়াহিয়ার সঙ্গে নাকি তোমার সমঝোতা হচ্ছে?'

মুজিব কিছু না বলে খেতে থাকেন।

'সমঝোতা কোরো না।' রেনু বলেন।

মুজিব রেগে গিয়ে বলেন, 'আলোচনা হচ্ছে। এখনো কিছু হয় নাই।'

রেনু বলেন, 'খবরদার, তুমি আপস করবে না। কিসের সমঝোতা ইয়াহিয়ার সঙ্গে? তুমি যদি সমঝোতা করো, দেশের মানুষ তোমার ওপর ক্ষুব্ধ হবে। তারা আর তোমার সঙ্গে থাকবে না। তখন যেকোনো সময় ইয়াহিয়া তোমাকে মেরে ফেলতে পারবে।'

মুজিব আরও রেগে গিয়ে বলেন, 'আরে বললাম তো সমঝোতা হয় নাই। আলোচনা চলছে।'

রেনু নিজের ভাতের মধ্যে পানি ঢেলে দেন। সারা দিন তিনি আর ভাত খাননি। দুপুরে খাননি, রাতে খাননি।

শেষে মুজিব তাঁকে বললেন, 'তুমি আমাকে এই চিনলা, আমি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রিত্বের জন্য বাংলাদেশের মানুষের সাথে বেইমানি করব? আমার জীবন যেতে পারে, কিন্তু আমি দেশের মানুষের মুক্তি ছাড়া আর কিছু চাই না। ওঠো, ভাত খাও।'

বেগম মুজিব খাবার টেবিলে বসলেন। মুজিবও বসলেন। খাওয়ার পর তিনি তাঁর পানের বাটাটা নিয়ে খুব যত্ন করে পান বানালেন। একটা নিজের জন্য। একটা হাসুর আব্বার জন্য।

মুজিব পান চিবুতে চিবুতে ভাবলেন, এই ছোটখাটো মানুষটা রাজনীতির এমন জটিল সমীকরণ এত সহজ করে বোঝে কী করে। যেমন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে প্যারোলে মুক্তি নিয়ে লাহোরের গোলটেবিল বৈঠকে যাওয়ার আইয়ুব খানের প্রস্তাবে রেনু 'না' করে দিয়েছিলেন। তিনি হাসুকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন বন্দী মুজিবকে, 'খবরদার, তুমি প্যারোলে মুক্তি নেবে না। তোমাকে নিঃশর্তভাবে ছাড়তে হবে।'

২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস। সারা বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি ভবন ছাড়া কোথাও পাকিস্তানের পতাকা ওড়েনি। সবখানে উড়েছে বাংলাদেশের নতুন পতাকা। পল্টনে ছাত্ররা বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে 'আমার সোনার বাংলা' গানটি গায়। সেখান থেকে ৩২ নম্বরে এসে সেই পতাকা মুজিবের হাতে তুলে দেয়। সেই পতাকা ওঠানো হয়। ছাত্ররা অভিবাদন জানায়।

সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। ওয়াজেদ সাহেব একটা সুটকেস নিয়ে গাড়ি চালিয়ে ভাড়া করা বাসায় চলে গেলেন।

হাসিনা আর রেহানা আব্বাকে ধরে কাঁদলেন অনেকক্ষণ। তারপর বিদায় নিয়ে মুজিবের গাড়িতে করে চলে এলেন ভাড়া বাসায়। সঙ্গে পাগলা।

জামাল গিয়ে আশ্রয় নিলেন জাপানি কনস্যুলেটের বাড়িতে।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীর জনসংযোগ কর্মকর্তা সাদিক মালিক টিক্কা খানের আর্মি সদর দপ্তরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি দেখছিলেন ট্যাংক, কামান, রিকোয়েললেস রাইফেলবাহী সাঁজোয়া গাড়ি মধ্যরাতের আগেই রওনা হয়ে গেল। শুরু হলো রাইফেলে গুলির আওয়াজ। এতক্ষণ ছিল জয় বাংলা স্লোগান। এখন গুলির শব্দে তা স্তিমিত হতে শুরু করেছে।

প্রথম গুলির শব্দের পরই সরকারি পাকিস্তানি রেডিওর পাশের ওয়েভ লেংথে ক্ষীণ কণ্ঠে গেল শেখ মুজিবের কণ্ঠস্বর, 'হয়তো এটাই আমার শেষ নির্দেশ। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন।'

তারপর কামানের গোলা, ট্যাংকের গোলা। আকাশে ট্রেসার মাইন। নরকের দরজা খুলে দেওয়া হলো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কোয়ার্টারে গিয়ে ধরে এনে হত্যা করা হলো অধ্যাপক জিসি দেব, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা প্রমুখকে। মধুর ক্যানটিনের মধুদাকে মারা হলো সপরিবার। জগন্নাথ হল থেকে ছাত্রদের বের করে মাঠে এনে লাইন করে দাঁড় করানো হলো। তারপর গুলি। পাশে ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটির শিক্ষক তাঁর ভিডিও ক্যামেরায় সেটা শুট করলেন। সারি সারি ছাত্র গুলিতে লুটিয়ে পড়ছে...কামানের গোলায়

উড়িয়ে দেওয়া হতে লাগল রাজারবাগ পুলিশ লাইন, পিলখানা ইপিআর...বস্তিতে বস্তিতে আগুন লাগিয়ে জ্বলন্ত ছুটন্ত নারী-শিশু, মানুষকে গুলি করা হতে লাগল।

পরে লে. জেনারেল নিয়াজি লিখবেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের নৃশংসতা চেঙ্গিস খান ও হালাকু খানের বুখারা ও বাগদাদের নৃশংসতাকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

মুজিবের বাড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে কমান্ডো বাহিনী। পথে পথে ব্যারিকেড। তারা রকেট লঞ্চার থেকে গোলাবর্ষণ করতে করতে এগোচ্ছে। নেতৃত্ব দিচ্ছেন লে. কর্নেল জেড এ খান। তাঁর সঙ্গে আছেন মেজর বিলাল। মুজিবের বাড়ির কাছাকাছি হতেই প্রহরীরা গুলিবর্ষণ করতে শুরু করল। পাল্টা গুলি চালিয়ে তারা তাদের নীরব করে দিতে সক্ষম হলো। ৫০ জন প্রশিক্ষিত কমান্ডো সেনা মুজিবের বাড়ির দেয়াল টপকে ভেতরে প্রবেশ করে তাদের উপস্থিতি জানান দিল স্টেনগানের গুলিতে। ঝাঁঝরা হয়ে গেল মুজিবের বাড়ির উঠানের পায়রার বাসা, মরে পড়ে রইল পায়রাগুলো। তারা গুলি ছুড়তে ছুড়তে উঠে গেল দোতলায়। খুঁজে পেল মুজিবের শয়নকক্ষ। সেটা ভেতর থেকে আটকানো। তারা গুলি করল ধাতব লকারে। দরজা খুলে গেল।

মুজিব বেরিয়ে এলেন।

বাড়ির সব পুরুষকে ধরে জিপে তোলা হলো।

মুজিবকেও।

মেজর জাফর ওয়্যারলেসে বললেন, 'বিগ বার্ডস ইন দ্য কেজ, আদারস নট ইন দেয়ার নেস্টস। ওভার।'

পুলিশ পাল্টা গুলি ছুড়ছে। ইপিআররা পাল্টা গুলি ছুড়ছে। সারা দেশে বাঙালি সৈন্যরা যে যেখানে পারল, বিদ্রোহ করল। কোথাও কোথাও তারা বন্দী করল পাকিস্তানিদের। দেশের বহু এলাকা সে রাতেই স্বাধীন হয়ে গেল আওয়ামী লীগ ও বেসামরিক প্রশাসনের মাধ্যমে।

শেহেরজাদি বলল, 'বাদশাহ, আপনি কি জানতে চান পাকিস্তানি সৈন্যরা ক্যান্টনমেন্ট থেকে বেরিয়ে কী করল?'

শাহরিয়ার বললেন, 'জানতে চাই।'

'আপনি কি তা সহ্য করতে পারবেন?'

'আমি রোজ একজন করে নারীকে হত্যা করি। আমার চেয়েও নিষ্ঠুর আর কে হতে পারে?'

'আপনার চেয়েও নিষ্ঠুর হতে পারে ইয়াহিয়া খান। টিক্কা খান। খাদিম হোসেন রাজা। রাও ফরমান আলী খান।'

'না, হতেই পারে না।'

'আপনি একজন সুইপারের ভাষ্য শুনুন।'

'আমি ১৯৬১ সাল থেকে ঢাকা পৌরসভার অধীনে সুইপার ইন্সপেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ আমি আমার সুইপারের দল নিয়ে দায়িত্ব পালন করে সন্ধ্যায় ৪৫/১, প্রসন্ন পোদ্দার লেনে আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর বাড়িতে অবস্থান করছিলাম। রাত নয়টার দিকে আমি ঢাকা ইংলিশ রোডের দিকে বের হয়ে দেখলাম, রাস্তাঘাট চারদিকে থমথমে, সব ধরনের যানবাহনকে দ্রুত গন্তব্যস্থলের দিকে যেতে দেখলাম। ছাত্র-জনতাকে রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করতে দেখলাম। প্রতিরোধ তৈরিতে ব্যস্ত ছাত্র-জনতার কাছে জানতে পারলাম, ঢাকা সেনানিবাস থেকে পাকিস্তানি সেনারা রাজধানী ঢাকার দিকে সামরিক ট্রাক নিয়ে এগিয়ে আসছে। পাকিস্তানি পশুদের প্রতিরোধ করার জন্য ছাত্র-জনতার এ প্রচেষ্টা ও প্রয়াস। আমি সবকিছু দেখে অত্যন্ত ভারাক্রান্ত মনে বাসায় চলে গেলাম। রাত সাড়ে ১১টার দিকে রাজারবাগ পুলিশ লাইনস, পুলিশ হেডকোয়ার্টার, পুলিশ অফিস ও মালিবাগ গোয়েন্দা অফিসের দিকে আকাশফাটা গোলাগুলির ভীষণ গর্জন শুনে

আমি ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখলাম, রাজধানীর উত্তরে বস্তি এলাকা জ্বলছে। রাজারবাগ থেকে গোলাগুলির শব্দ শোনার সময় ঢাকা শাঁখারীবাজার প্রবেশপথে বাবুবাজার ফাঁড়িতে ভীষণ শেলিংয়ের গর্জন শুনলাম। আমি নিকটবর্তী নয়াবাজার সুইপার কলোনির দোতলায় দাঁড়িয়ে চারদিকে গোলাগুলির ভীষণ গর্জন শুনলাম।

'২৬ মার্চ প্রত্যুষে আমি সুইপার কলোনির দোতলা থেকে দৌড়ে নেমে বাবুবাজার ফাঁড়িতে গিয়ে দেখলাম ফাঁড়ির প্রবেশপথ, ভেতরে, চেয়ারে বসে, উপুড় হয়ে পড়ে থাকা ১০ জন পুলিশের ইউনিফর্ম পরা গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত লাশ পড়ে আছে। আমি ফাঁড়ির ভেতরে প্রবেশ করে দেখলাম, ফাঁড়ির চারদিকের দেয়াল হাজারো গুলির আঘাতে ঝাঁঝরা হয়ে আছে। দেয়ালের চারদিকে মেঝেতে চাপ চাপ রক্ত, তাজা রক্ত জমাট হয়ে আছে, দেখলাম কেউ জিব বের করে পড়ে আছে, কেউ হাত-পা টানা দিয়ে আছে, প্রতিটি লাশের পবিত্র দেহে অসংখ্য গুলির আঘাত। মানবতার অবমাননা ও লাঞ্ছনার বীভৎস দৃশ্য দেখে আমি একটি ঠেলাগাড়িতে করে সব লাশ ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশঘরে রেখে আবার ঠেলাগাড়ি নিয়ে শাঁখারীবাজারে প্রবেশ করে একেবারে পূর্বদিকে ঢাকা জজকোর্টের কোণে হোটেল-সংলগ্ন রাস্তায় ১০টি ফকির-মিসকিন ও রিকশার মেরামতকারী মিস্ত্রির উলঙ্গ ও অর্ধ-উলঙ্গ লাশ ওঠালাম। কোনো হিন্দুর লাশ আমি রাস্তায় পাইনি। সব কটি লাশ মুসলমানের ছিল। রাস্তায় পড়ে থাকা গুলিতে ঝাঁঝরা ১০টি লাশ ঠেলাগাড়িতে তুলে আমি মিটফোর্ড নিয়ে গিয়েছি। মুসলমানদের লাশ এভাবে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেওয়া যায় না। তাই আমরা স্থানীয় ছাত্র-জনতা সবাই মিলে লাশগুলো তুলে মিটফোর্ডে জমা করেছি।

'রাজধানীতে ছাত্র-জনতা রাস্তায় রাস্তায় বের হয়ে পড়লে পাকিস্তানি সেনারা ঘোষণা করে, ঢাকায় কারফিউ বলবৎ রয়েছে, কেউ রাস্তায় বের হলে গুলি করা হবে। পাকিস্তানি সেনাদের এ ঘোষণার পর আমরা সরে পড়লাম। দিনের শেষে বিকেল পাঁচটার সময় তাঁতিবাজার, শাঁখারীবাজার ও কোর্ট হাউস স্ট্রিট এলাকায় পাকিস্তানি সেনারা আগুন ধরিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে বৃষ্টির মতো অবিরাম গুলিবর্ষণ। সারা রাত পাকিস্তানি সেনারা তাঁতিবাজার, শাঁখারীবাজার ও গোয়ালনগর এলাকায় অবিরাম

গুলিবর্ষণ করতে থাকে। ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ বেলা একটার সময় পাকিস্তানি সেনারা নবাবপুর থেকে ইংলিশ রোডের বাণিজ্য এলাকার রাস্তার দুই দিকের সব দোকানপাটে আগুন ধরিয়ে দেয়। বেলা তিনটা পর্যন্ত ইংলিশ রোডের রাস্তার দুই দিকে আগুন জ্বলতে থাকে। আগুনের সেই লেলিহান শিখায় পার্শ্ববর্তী এলাকার জনতা আশ্রয়ের জন্য পালাতে থাকে। পালাতে গিয়ে পাকিস্তানি সেনাদের গুলির আঘাতে অনেকে প্রাণ হারায়। বেলা তিনটায় পাকিস্তানি সেনারা তাঁতিবাজারের বাহির পথ ও মালিবাগের পুলের পশ্চিম পাশে হিন্দু মন্দিরের ওপর শেলিং করে মন্দিরটি ধ্বংস করে দেয়।

'ইংলিশ রোডের আগুন সুইপার কলোনির দিকে ধেয়ে আসতে থাকলে আমি সুইপারদের কলোনির পানি রিজার্ভ করে রাখার নির্দেশ দিই। পাকিস্তানি সেনাদের ডিঙিয়ে সব সুইপার মিলে সুইপার কলোনিটি রক্ষা করার জন্য অগ্রসর হলে আমরা পাকিস্তানি সেনাদের গুলির মুখে চলে আসি। ১৯৭১ সালের ২৮ মার্চ সকালে রেডিও মারফত সব সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারীকে অবিলম্বে কাজে যোগদান করতে হবে, এ নির্দেশ পেয়ে পরদিন আমি সকাল ১০টার সময় ঢাকা পৌরসভায় ডিউটি রিপোর্ট করলে ঢাকা পৌরসভার তৎকালীন কনজারভেন্সি অফিসার ইদ্রিস আমাকে ডোম নিয়ে অবিলম্বে ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় পড়ে থাকা লাশ তুলে ফেলতে বলেন। ইদ্রিস সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে বলতে থাকেন, "সাহেব আলী, বের হয়ে পড়ো, যদি বাঁচতে চাও, তবে ঢাকার রাজপথ ও বিভিন্ন এলাকা থেকে লাশ তোলার জন্য বের হয়ে পড়ো। কেউ বাঁচবে না, কাউকে রাখা হবে না, সবাইকে পাক সেনাদের গুলিবর্ষণে মরতে হবে, সবাইকে কুকুরের মতো হত্যা করা হবে।" পৌরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান মেজর সালামত আলী খান শুরু থেকে আমাদের সঙ্গে কুকুরের মতো উত্তেজিত হয়ে, অত্যন্ত কর্কশ স্বরে ক্রুদ্ধভাবে বকাবকি করতে থাকেন। সেখানে আমি, সুইপার ইন্সপেক্টর আলাউদ্দিন, সুইপার ইন্সপেক্টর কালীচরণ, সুইপার সুপারভাইজার পাঞ্চাম, সুইপার ইন্সপেক্টর আওলাদ হোসেন—আমরা পাঁচজন উপস্থিত ছিলাম। আমাকে পরদেশি ডোম, মন্টু ডোম, লেমু ডোম, ডোম গোলাপ চান, দুখিলা ও মধু ডোমকে নিয়ে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতাল থেকে লাশ তুলে স্বামীবাগ আউটকলে ফেলতে বলা হয়।

'১৯৭১ সালের ২৯ মার্চ আমার দল ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালের লাশঘর থেকে দুই ট্রাক লাশ তুলেছে। আমার দল যেসব লাশ তুলেছে, আমি স্বচক্ষে তা দেখেছি। অধিকাংশই ছিল সরকারি কর্মচারী, পুলিশ, আনসার ও পাওয়ারম্যানদের খাকি পোশাক পরা বিকৃত লাশ। লাশ তুলতে তুলতে পরদেশি নামে আমার জনৈক ডোমের হাতে এক ষোড়শী রূপসীর উলঙ্গ ক্ষতবিক্ষত লাশ দেখলাম, দেখলাম সেই যুবতীর পবিত্র দেহে অসংখ্য ক্ষতচিহ্ন, তাঁর বুক থেকে স্তন তুলে নেওয়া হয়েছে, লজ্জাস্থান ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে, পেছনের মাংস তুলে নেওয়া হয়েছে। হরিণের মতো মায়াভরা মধুময় বড় বড় চোখ ঘুমিয়ে আছে, সারা দেহে সৃষ্টিকর্তা যেন দুধের সর দিয়ে আবৃত করে দিয়েছেন, মাথায় কালো কালো চুল তাঁর কোমর পর্যন্ত লম্বা হয়ে পড়ে ছিল, তাঁর দুই গালে আঘাতের চিহ্ন দেখলাম। পরক্ষণেই দেখলাম ১০ বছরের এক কিশোরীর উলঙ্গ ক্ষতবিক্ষত লাশ। অপরূপা রূপসী ফলের মতো টকটকে চেহারা, সারা দেহে বুলেটের আঘাত। ১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল থেকে ভারপ্রাপ্ত পাকিস্তানি সেনাদের মেজর পৌরসভায় টেলিফোনে সংবাদ দেন রোকেয়া হলের চারদিকে মানুষের লাশের পচা গন্ধে সেখানে বসা যাচ্ছে না, অবিলম্বে ডোম পাঠিয়ে লাশ তুলে ফেলা হোক।

'আমি ছয়জন ডোম নিয়ে রোকেয়া হলে প্রবেশ করে রোকেয়া হলের সব কক্ষে তন্নতন্ন করে খুঁজে কোনো লাশ না পেয়ে চারতলার ছাদের ওপর গিয়ে ১৮ বছরের জনৈক রূপসী ছাত্রীর উলঙ্গ লাশ দেখতে পেলাম। আমার সঙ্গে দায়িত্বরত জনৈক পাকিস্তানি সেনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ ছাত্রীর দেহে গুলির কোনো আঘাত নেই, দেহের কোনো স্থানে কোনো ক্ষতচিহ্ন নেই অথচ মরে চিত হয়ে পড়ে আছে কেন? সে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলল, "আমরা সব পাকিস্তানি সেনা মিলে ওকে ধর্ষণ করতে করতে মেরেছি।" পচা-ফোলা সেই রূপসীর উলঙ্গ দেহ পড়ে আছে দেখলাম। ডাগর ডাগর চোখ ফুলে বের হয়ে আছে, মাথার চুল কাছেই ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, লজ্জাস্থান তার পেট থেকে ফুলে অনেক ওপরে উঠে আছে, যোনিপথ রক্তাক্ত। তার দুই দিকের গালে পশুদের কামড়ের চিহ্ন দেখলাম, বক্ষের স্তনে মানুষের দাঁতের দংশনের চিহ্ন দেখলাম। আমি একটি চাদর

দিয়ে লাশটি ঢেকে দিয়ে নামিয়ে নিয়ে আসি। রোকেয়া হলের সার্ভেন্ট কোয়ার্টারের ভেতরে প্রবেশ করে পাঁচজন মালির স্ত্রী-পরিজনদের পাঁচটি লাশ এবং আটটা পুরুষের লাশ (মালি) পেয়েছি। লাশ দেখে মনে হলো মৃত্যুর আগে সবাই শুয়ে ছিল। আমি ট্রাক নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিববাড়ির তেতলা থেকে জনৈক হিন্দু অধ্যাপক, তাঁর স্ত্রী ও দুই ছেলের লাশ তুলেছি।

'স্থানীয় জনতার মুখে জানতে পারলাম, তাঁর দুই মেয়ে বুলেটবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে আছেন। সংগৃহীত লাশ স্বামীবাগ আউটকলে ফেলে দিয়ে আমরা ট্রাক নিয়ে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে ভাসমান হাত-পা, চোখ বাঁধা অসংখ্য যুবকের লাশ তুলেছি। আমরা ৩০ মার্চ বুড়িগঙ্গা নদী থেকে তিন ট্রাক লাশ তুলে স্বামীবাগ ফেলেছি। পাকিস্তানি সেনারা কুলি দিয়ে আগেই সেখানে বিরাট বিরাট গর্ত করে রেখেছিল। পরের দিন আমরা মোহাম্মদপুর এলাকার জয়েন্ট কলোনির কাছ থেকে সাতটি পচা-ফোলা লাশ তুলেছি। ইকবাল হলে (সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) আমরা কোনো লাশ পাইনি। পাকিস্তানি সেনারা আগেই ইকবাল হলের লাশ পেট্রল দিয়ে জ্বালিয়ে ভস্ম করে দেয়। বস্তি এলাকা থেকে জগন্নাথ হলে আশ্রয়ের জন্য ছুটে আসা ১০ জন নর-নারীর ক্ষতবিক্ষত লাশ তুলেছি।

'ফেরার পথে আমরা ঢাকা হলের ভেতর থেকে চারজন ছাত্রের উলঙ্গ লাশ তুলেছি। ১৯৭১ সালের ১ এপ্রিল আমরা কচুক্ষেত, ড্রাম ফ্যাক্টরি, তেজগাঁও, ইন্দিরা রোড, দ্বিতীয় রাজধানী এলাকার ঢাকা বিমানবন্দরের অভ্যন্তর, ঢাকা স্টেডিয়ামের মসজিদের পূর্ব-দক্ষিণ দিক থেকে কয়েকজন ছাত্রের পচা লাশ তুলেছি। এরপর প্রতিদিন আমরা বুড়িগঙ্গা নদীর পাড় থেকে হাত-পা, চোখ বাঁধা অসংখ্য যুবকের লাশ তুলেছি। মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল কলেজের হল থেকে ১০ জন ছাত্রের ক্ষতবিক্ষত লাশ তুলেছি। রায়েরবাজার রাস্তা, পিলখানা, গণকটুলী, ধানমন্ডি, কলাবাগান, কাঁঠালবাগান, এয়ারপোর্ট রোডের পার্শ্ববর্তী এলাকা, তেজগাঁও মাদ্রাসা থেকে অসংখ্য মানুষের পচা-ফোলা লাশ তুলেছি। অনেক লাশের হাত-পা পেয়েছি, মাথা পাইনি। মেয়েদের লাশ সবই উলঙ্গ ও ক্ষতবিক্ষত দেখেছি।

'কিছুদিন পর আমি কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতো কারখানায় গিয়ে সাধনা ঔষধালয়ের মালিক প্রফেসর যোগেশ চন্দ্রের বেয়নেটের আঘাতে

ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত তাজা লাশ তুলে স্বামীবাগ ফেলেছি। পাকিস্তানি পশুরা যোগেশ বাবুর সর্বস্ব লুণ্ঠন করে তাঁকে তাঁর নিজস্ব কামরায় বক্ষে বেয়নেট ঢুকিয়ে দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করে রেখে যায়। পরে তাঁর পবিত্র ক্ষতবিক্ষত লাশ নিচে নামিয়ে এনে খাটের ওপর রেখে দিয়েছিল। আমরা গিয়ে দেখলাম, যোগেশবাবুর লাশ জিব বের করে হাঁ করে আছে। গায়ে ছিল ধুতি আর গেঞ্জি।'

হোয়াইট হাউসে বসে প্রেসিডেন্ট নিক্সন আর তাঁর নিরাপত্তা উপদেষ্টা গল্পগুজব করেন। বিষয় : পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর অভিযান।

মার্চের ২৯, ১৯৭১ কিসিঞ্জার বলেন, 'মনে হচ্ছে, ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছেন।'

'গুড।' নিক্সন মাথা নাড়েন।

'অনেক সময় শক্তিপ্রয়োগে কাজ হয়। বিরূপ পরিস্থিতিতে কাজ হয়। অবশ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, ৩০ হাজারকে দিয়ে সাড়ে সাত কোটিকে কন্ট্রোল করা যায় না। হয়তো ভবিষ্যতে কথাটা ঠিক বলে প্রমাণিত হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে সবকিছু ঠান্ডা মেরে গেছে।'

নিক্সন বলেন, 'হয়তো এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। কিন্তু ইতিহাসে অনেক জাতির বেলাতেই দেখা গেছে ৩০ হাজার প্রশিক্ষিত মানুষ সাড়ে সাত কোটি মানুষকে দমাতে পেরেছে। স্প্যানিশদের দেখুন, তারা কজন মাত্র এল আর ইনকাদের দখল করে ফেলল। ব্রিটিশরাও অল্প কজনই গেছে ভারতে এবং ভারতকে দখল করেছে।'

'একদম ঠিক।' কিসিঞ্জার বললেন।

নিক্সন বললেন, 'যা-ই হোক। আমি ইয়াহিয়ার ভালো চাই। তার মানে পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার চেয়ে না ভাঙা ভালো। তবে আসল কথা হলো,

তারা কি এই গড-ড্যাম দেশটাকে আসলেই চালাতে পারবে।'

কিসিঞ্জার বললেন, 'তা অবশ্য ঠিক। ইতিহাসে দেখা গেছে, বাঙালিদের শাসন করা সব সময়ই কঠিন।'

তাঁরা তাঁদের কর্তব্য ঠিক করেন। 'আমরা কিছু করব না।' প্রেসিডেন্ট বলেন, 'বায়েফরার মতোই আমরা কিছুই করব না। যেমন আমরা বায়েফরার ক্ষুধার্ত মানুষকে গুলি করা পছন্দ করি নাই। তবু কিছুই করি নাই।'

'ঠিক ঠিক।' কিসিঞ্জার বলেন।

আমেরিকান দুই কূটনীতিক ঢাকা থেকে আর্চার ব্লাড এবং দিল্লি থেকে রাষ্ট্রদূত কিটিং ওয়াশিংটনে তারবার্তা পাঠাচ্ছেন বাংলাদেশের ভয়াবহ পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়ে। নির্বাচিত গণহত্যা কথাটা তাঁরা ব্যবহার করেছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের হত্যা করা হয়েছে, ছাত্রদের হত্যা করা হয়েছে। এই খবরও পেয়েছেন কিসিঞ্জার। তিনি সিআইএর একজন কর্মকর্তাকে জিগ্যেস করলেন, 'তারা কি অধ্যাপক রাজ্জাককেও হত্যা করেছে?'

'মনে হয়। কারণ, তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষককেই হত্যা করেছে।'

এবার কিসিঞ্জার চুপ করে গেলেন। তাঁর মনে পড়ে গেল বিশ্ববদ্যালয় জীবনের পরিচিত মুখটাকে। যাঁর নাম রাজ্জাক। যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ান। তিনি স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

শেহেরজাদি বলল, 'ইয়াহিয়া খানের সবকিছু বেড়ে গেছে। তিনি এখন আরও বেশি করে মদ খান। আরও বেপরোয়াভাবে নারীসঙ্গ করেন। সকাল থেকেই নারীরা তাঁর প্রেসিডেন্ট হাউসে ঢুকতে থাকে। সারা দিন থাকে।

কেউ কেউ থাকে সারা রাত। হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্টে বলা হবে, ৫০০ নারী প্রেসিডেন্ট হাউসে যাতায়াত করেছেন ১৯৭১ সালে। এঁদের প্রত্যেকে প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে নানাবিধ রাষ্ট্রীয় সুবিধা গ্রহণ করেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন জেনারেল নাসিম, হামিদ, লতিফ, খুদাদাদ, ইয়াকুব, রিয়াজ, পীরজাদা, মিয়া এবং আরও অনেকের স্ত্রীরা। এঁরা ছিলেন নিয়মিত দর্শনার্থী। আরও আছেন বেগম জুনাগড়, নাজলি বেগম, মিসেস জয়নব ১, মিসেস জয়নব ২, আনোয়ারা বেগম, ঢাকার শিল্পপতি লিলি খান, লায়লা মোজাম্মিল, নায়িকা শবনম, শাগুফতা, নাগমা।'

শাহরিয়ার বললেন, 'এটা তুমি কী বলছ? ৫০০ জন? এ তো আমাকেও হার মানিয়েছে।'

শেহেরজাদি বলল, 'আমি বলছি না যে এঁদের প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক হয়েছিল, কিন্তু এঁরা অনেকেই প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে অনেক অবৈধ সুযোগ আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।'

শাহরিয়ার বলেন, 'এটা অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য।'

শেহেরজাদি বলল, 'ইয়াহিয়া ইসলামাবাদ আর লাহোরের রাজপথে খোলা জিপে চড়ে তাঁর বান্ধবীদের নিয়ে ঘুরতেন। এমনকি গাড়িতে দাঁড়িয়ে খোলা আকাশের নিচে প্রকাশ্যে তিনি তাদের চুম্বন করতে শুরু করলেন। তিনি এটা করতেন প্রতি রাতে। একেক দিন একেকজন থাকত তাঁর পাশে। তাঁর পেছনে পেছনে যেত তাঁকে প্রহরারত নিরাপত্তারক্ষীরা। তারা সবই দেখত।'

পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের এসপি সরদার মুহাম্মদ চৌধুরী গেলেন ডিআইজি কাজী মুহাম্মদ আজমের কাছে।

'স্যার।'

'বলুন।'

'প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটি নিয়ে আমার একটা উদ্বেগ আছে, স্যার।'

'কী সেটা, বলুন।'

'স্যার, প্রেসিডেন্ট রোজ রাতে খোলা জিপ নিয়ে বের হন। খোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে পাশের সঙ্গিনীকে প্রকাশ্যে চুম্বন করেন। এই নিয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের মধ্যেই নানান গুঞ্জন। তারা নিজেরাই ক্ষুব্ধ। যেকোনো দিন কেউ যদি খেপে গিয়ে কিছু করে বসে, স্যার।'

'সরদার। দেশে কী হচ্ছে, আপনি জানেন। পূর্বে আমাদের সৈনিকেরা যুদ্ধ করছে। সেখানে আমাদের সৈনিকেরা মারা যাচ্ছে। প্রেসিডেন্টের ওপরে কত চাপ। তাঁর কত উদ্বেগ। তাঁর তো একটু আমোদ-ফুর্তির দরকার আছে। তা না হলে তিনি রাষ্ট্রীয় কার্য চালাবেন কী করে।'

'তা তো বটেই, স্যার। তা তো বটেই, স্যার।'

ইয়াহিয়া আর পারছেন না। আর ভালো লাগে না। পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্যরা লড়াই করছে। ভালো খবর আসছে। খারাপ খবরও আসছে। খারাপ খবরের মধ্যে হলো ভারতীয়রা যুদ্ধে অংশ নিচ্ছে নানাভাবে। ইন্দিরা গান্ধী পৃথিবীময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর ওখানে নাকি এক কোটি শরণার্থী গেছে। এমনকি তিনি তাজউদ্দীনের নেতৃত্বে একটা প্রবাসী সরকারকেও ওই দেশে আশ্রয় দিয়েছেন। রাশিয়া ভারতকে অস্ত্র দিচ্ছে। আমেরিকা পাকিস্তানকে দিয়েছে অল্প কিছু অস্ত্র। এখন চীনের সাহায্য দরকার।

তিনি সোজা উঠলেন শামীমের বাসায়। মিসেস কে এন হুসেন। তাঁর স্বামীকে পশ্চিম পাকিস্তানে আনা হয়েছিল স্পেশাল ব্রাঞ্চের আইজি করে। এরপর স্বামী বেচারাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সুইজারল্যান্ডে, রাষ্ট্রদূত করে। এখন শামীম তাঁর বাসায় একা। প্রেসিডেন্ট সেখানে গিয়ে উঠলেন।

বাইরে নিরাপত্তারক্ষীরা সব দাঁড়িয়ে আছে।

ইয়াহিয়ার আর বেরোনোর নাম নেই। তিন দিন তিন রাত প্রেসিডেন্ট সেই বাড়িতে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সংযোগহীন অবস্থায় কাটিয়ে দিলেন।

চতুর্থ দিন তাঁকে দেখা গেল বেরোতে। তাঁর বগলে শামীম। শামীমকে নিয়ে তিনি উঠলেন রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে। সেখানে শামীমকে চাকরি দেওয়া হলো। পদের নাম, ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর।

এখন আর প্রেসিডেন্টের কোনো অসুবিধাই রইল না শামীমের সঙ্গসুধা ভোগের। যখনই ইচ্ছা হতো, তিনি চলে আসতেন এই অতিথি ভবনে।

তিনি লাহোরে চলে যেতেন প্রায়ই। সেখানে আসতেন ম্যাডাম নুরজাহান।

'নুরি!'

'সরকার।'

'তোমার এখনকার ড্রেসটা আরও সুন্দর।'

'সকালেরটা কি খারাপ ছিল।'

'না। তবে এটা আরও সুন্দর।'

'রাতেরটা আরও সুন্দর হবে, সরকার।' নুরজাহান ইয়াহিয়াকে ডাকতেন সরকার বলে।

নুরজাহান বললেন, 'সরকার, আমি টোকিও যাব। আমার ডলার দরকার।'

'সরকারি ট্যুরে যাচ্ছ। যাও। ডলার নিয়ে যাও।'

'আপনার লোকেরা আমাকে ডলার দিতে রাজি না। এটা নাকি নিয়মে নাই। আমি টাকা পেতে পারি। কিন্তু ডলার না।'

'নিয়ম কী? সামরিক আইনে সামরিক আইন প্রশাসক যা বলবে তা-ই নিয়ম। যাও। ডলার তোমার ঘরে পৌঁছে যাবে।'

নুরি আর ইয়াহিয়া এক ঘরে। গুরুত্বপূর্ণ কাজের ডাক এসেছে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে। কিসিঞ্জার যাবেন চীনে। তার দূতিয়ালি করছে পাকিস্তান। খুবই জরুরি একটা কাজ করতে হবে।

কে ঢুকবে রাষ্ট্রপতির কক্ষে।

আবারও ডাক পড়ল জেনারেল রানি ওরফে আকলিমের।

রাষ্ট্রপতির একটা জিনিস ছিল, তিনি তাঁর খাস কামরার বিশাল কাঠের দরজার কবাটে কখনো ছিটকিনি লাগাতেন না।

দুটো নক করে আকলিম ঢুকে গেলেন ইয়াহিয়ার ঘরে।

পরে তিনি হামদুর রহমান কমিশনের তদন্তে বলবেন, 'ম্যাডাম নুরি ও আগা জানি সম্পূর্ণ নগ্ন। ম্যাডামের সমস্ত শরীরে ইয়াহিয়া হুইস্কি ছিটাচ্ছেন। আর উবু হয়ে সেই হুইস্কি তিনি পান করছেন।'

তদন্তকারী কর্মকর্তা পরে সেই কথা প্রকাশ করে দেবেন।

আরেক দিনের ঘটনা। অনেক রাতে আকলিমের কাছে এসেছেন তাঁর আগা জানি। তাঁর পা টলটলায়মান। তাঁর কণ্ঠস্বর জড়িয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন, 'রানি, রানি, তুমি কি ওই গানটা জানো? চিচে দা চালা।'

'না।'

'আরে *থি রানি* সিনেমার গান।'

'গান শোনার সময় কই আমার, আগা জানি।'

'কিন্তু ওই গানটা যে আমার এখনই শুনতে হবে, রানি।'

'আপনি বসেন। আপনার পদসেবা করে ধন্য হই।'

'না। ইসহাক। ইসহাক।'

'স্যার।'

'আমার এখনই এই গান শুনতে হবে—চিচে দা চালা। যাও, যেখান থেকে পারো ওই গানের ক্যাসেট আনো।'

'স্যার। এখন বাজে রাত দুটো, স্যার।'

'তো?'

'সব দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে, স্যার।'

'তাতে কী? আমি পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক। আমার এখন গান শুনতে ইচ্ছা করছে। আমি এখনই শুনব। যাও। দোকানে যাও। দোকান ভাঙো। ক্যাসেট নিয়ে আসো।'

সৈনিকেরা ছুটল তখনই। ক্যাসেটের দোকানে গিয়ে দোকানির ঘুম ভাঙাল। ক্যাসেট জোগাড় করল। রাত তিনটার মধ্যে আকলিমের বাড়িতে চলে এল সেই ক্যাসেট।

আগা জানি সেই গান শুনে ভুঁড়ি দুলিয়ে নাচতে লাগলেন।

নাজলি বেগম তাঁর এক লীলাসঙ্গিনী।

পার্টিতে গিয়ে তিনি কোলে বসে পড়লেন ইয়াহিয়ার।

'কী ডার্লিং। কী চাও?'

'আপনার অনুগ্রহ চাই। জনাব।'

'অনুগ্রহ কেন। তুমি আমার প্রেম পাবে।'

'জনাব, আমি পিআইসিসি ব্যাংক থেকে লোন চেয়েছি। ব্যাংকের এমডি আমাকে লোন দিচ্ছে না।'

'ওকে। কালকেই ওর চাকরি খেয়ে ফেলব। তোমার মতো সুন্দরী ভদ্রমহিলাকে যে অপমান করবে, তার স্থান পাকিস্তান মুলুকে হবে না। হতে পারে না।'

পরের দিনই বেচারা ব্যাংক এমডির চাকরি চলে গেল।

৬১, হারলি স্ট্রিট রাওয়ালপিন্ডিতে ইয়াহিয়া একটা প্রাসাদ বানালেন। বলা ভালো, প্রমোদকুঞ্জ। সেখানে তিনি যেতেন, সেনাপ্রধান হামিদ যেতেন। নরক গুলজার হতো। নাচ-গান, মদ-নারী। হুল্লোড়-পার্টি।

সেনাপ্রধান জেনারেল হামিদ খান ডেকে পাঠিয়েছেন লে. জে. এ কে নিয়াজিকে।

'তোমাকে ইস্টার্ন কমান্ডের দায়িত্ব নিতে হবে।'

'স্যার।'

'টিক্কা খান তো পারছে না। তুমি গিয়ে দায়িত্ব নাও। টিক্কা খানকে গভর্নর করে দেব।'

'স্যার।'

'তোমার কোনো প্রশ্ন আছে?'

'জি না স্যার। আপনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। এটা মান্য করাই সৈনিক হিসেবে আমার কাজ, স্যার।'

নিয়াজি নিজেকে বলতেন টাইগার নিয়াজি।

তিনি ঢাকা গেলেন। টিক্কা খান সেনাপ্রধানের বাড়ি ছাড়তে চান না। গুল হাসানকে দিয়ে তিনি তাঁকে রাজি করালেন গভর্নর হাউসে উঠতে।

মেজর জেনারেল মিঠা ছিলেন টিক্কার সহযোগী। তিনি হেড কোয়ার্টারসে চিঠি লিখেছিলেন :

'এ অপারেশন এখন রূপ নিয়েছে একটি গৃহযুদ্ধে। দূরে যাওয়া যায় না, রেলগাড়িও ব্যবহার করা সম্ভব নয়। কোনো ফেরি অথবা নৌকা পাওয়া যাচ্ছে না। সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে চলাচলই এখন প্রধান বাধা। এ অবস্থা আরও কিছুদিন চলবে। সশস্ত্র বাহিনীকে নিজেদের বাহনেই চলতে পারতে হবে। আমি প্রস্তাব করছি : ১. চট্টগ্রাম বন্দরের জন্য নেভির পোর্ট অপারেটিং ব্যাটালিয়ন ২. আর্মি, নেভি বা ইঞ্জিনিয়ার রিভার ট্রান্সপোর্ট ব্যাটালিয়ন। তিন. নেভির কার্গো ও ট্যাংকার ফ্লোটিলা। রসদ ও সৈন্য চলাচলের জন্য আরও হেলিকপ্টার অপরিহার্য।'

'এর কিছুই তারা পায়নি।'

নিয়াজির মনে হলো, পুরো পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানি সৈন্যদের জন্য

একটা মৃত্যুফাঁদ। তারা ক্যান্টনমেন্টে বন্দী অবস্থায় থাকে। অনেকে মিলে পূর্ণ প্রস্তুতি ছাড়া বাইরে যেতে পারে না। বাইরে বেরোনো মানেই মৃত্যু। পুরোটা দেশ বেদখল হয়ে আছে, ক্যান্টনমেন্টগুলো ছাড়া। আর সীমান্ত বলতে তো কিছুই নেই।

নিয়াজি তাঁর দায়িত্ব বুঝে নিলেন। এই ছোটখাটো কালো বাঙালিকে দমন করতে কেন বেগ পেতে হচ্ছে, এই নিয়ে তাঁর মনে অনেক ক্ষোভ। তাঁর কোমরে একটা পিস্তল গোঁজা। অপারেশন রুমে সবাই সমবেত হয়েছে। টিক্কা খানও আছেন।

নিয়াজি ঢুকেই বললেন, 'মেয়ঁ এই হারামজাদি কৌম কি নাসাল বদল দুন গা। ইয়ে মুঝে কিয়া সমঝাতে হায়। আমি এই বেজন্মা জাতির চেহারা বদলে দেব। ওরা আমাকে কী ভেবেছে। আমি আমার সৈন্যদের ছেড়ে দেব এদের নারীদের ওপরে। তারা সন্তান উৎপাদন করবে। পরের প্রজন্ম নতুন চেহারার নতুন জাতি হিসেবে গড়ে উঠবে।'

এর পরের দিন খাদিম রাজার সঙ্গে নিয়াজি যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থান নিয়ে আলাপ করতে লাগলেন। খাদিম তাঁকে বিশদ বর্ণনা দিচ্ছেন, এই সময় নিয়াজি বলে উঠলেন, 'ইয়ার, লড়াই কি ফিকর নাহি করো, ওঁ তো হাম কার লেইন গে। আভি তো মুঝে বেঙ্গলি গার্লফ্রেন্ডস কা ফোন নম্বর দো। বন্ধু, যুদ্ধ নিয়ে চিন্তা কোরো না, সে আমি সামলাব, তুমি তোমার বাঙালি বান্ধবীদের ফোন নম্বর দাও।'

খাদিম রাজা তার পরের দিন ঢাকা ছেড়ে পাকিস্তানে চলে আসেন।

আকাশে উড়তে উড়তে তিনি শেষবারের মতো জলমগ্ন পূর্ব পাকিস্তানের দিকে তাকালেন। পূর্ব পাকিস্তান। তোমাকে নিয়াজির হাতে রেখে এলাম। লাহোরের গুলবাগে একটা পতিতালয় আছে। নাম সিরোরিটা হোম। সেখানে যৌনকর্মীরা থাকে। সেটা চালান মিসেস সায়িদা বুখারি। জেনারেল নিয়াজির বান্ধবী তিনি। নিয়াজি লাহোরের জিওসি ও কোর কমান্ডার থাকার সময় যে টাকাপয়সা খেতেন, যা উৎকোচ গ্রহণ করতেন, সায়িদা তা গ্রহণ করতেন নিয়াজির পক্ষ থেকে।

নিয়াজি ঢাকায় এসে পানের চোরাচালান শুরু করলেন। ঢাকা থেকে পান যেত সায়িদার কাছে।

নিয়াজি ঢাকার সেনানিবাসে তাঁর বাড়িটিতে নিয়মিত আসর বসাতেন

বাইজি নাচের। বাইজিরা আসত। জেনারেলরা আসতেন। এরা তাঁর তিন তারকাখচিত পতাকাওয়ালা গাড়িতে আসা-যাওয়া করত।

যখন বলা হলো, পাকিস্তানি সৈন্যরা ঠিকমতো খেতে পাচ্ছে না, লঙ্গরখানায় ঠিকভাবে খাবার যাচ্ছে না, নিয়াজি বললেন, 'এ কী কথা, পূর্ব পাকিস্তানের মাঠে কি কোনো গরু চরছে না, গোয়ালে কোনো গরু-ছাগল নাই, মানুষের গোলায় কি ধান-গম নাই?'

যখন এই অভিযোগ উঠল যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা ব্যাপকভাবে ধর্ষণ করছে অধিকৃত বাংলায়, তখন নিয়াজি বললেন, 'একজন সৈন্য থাকবে পূর্ব পাকিস্তানে, লড়াই করবে, মারা যাবে এবং সেক্স করতে ঝিলম যাবে—এটা তো আপনি আশা করতে পারেন না।'

হামুদুর রহমান কমিশনে লে. কর্নেল আজিজ খান এক বছর পরেই এই সাক্ষ্য দিয়ে বলবেন, 'যখন কমান্ডার নিজেই একজন ধর্ষক, তখন তাঁর অধীন সৈন্যরা কী করবেন, তা বলে দেবার অপেক্ষা রাখে না।'

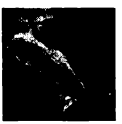

পাকিস্তানি সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানে নরক প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্যাংক কামান নিয়ে ঢুকে ছাত্রাবাসে আক্রমণ করা হয়েছে, পুলিশ ইপিআর হেডকোয়ার্টার বোমা-গোলায় ধ্বস্ত, জনপদে জনপদে আগুন দিয়ে পলায়নরত মানুষদের করা হয়েছে গুলি।

রাস্তায় রাস্তায় পড়ে আছে মানুষের লাশ।

জনপদের পর জনপদে পড়ে আছে পোড়া ছাই।

ঢাকার আমেরিকান কনসুল সেন্টারে কর্মরত আমেরিকান কর্তাদের বাড়িতে বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে ভীতসন্ত্রস্ত বাঙালি কর্মচারীদের পরিবার।

আর আমেরিকান সরকার পক্ষ নিচ্ছে ইয়াহিয়া খানের। আমেরিকান অস্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে নিরীহ মানুষ হত্যায়। নির্বাচিত গণহত্যায়।

টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম পাঠানো হচ্ছে ঢাকা থেকে। ওয়াশিংটনে। এবং তার অনুলিপি যাচ্ছে ইসলামাবাদে, দিল্লিতে, কলকাতায়, আমেরিকান কূটনৈতিক মিশনগুলোতে। কিন্তু নিক্সন ও কিসিঞ্জারের এক কথা—আমরা আছি আমাদের বন্ধু ইয়াহিয়ার পাশে। তিনি খুব ভালো মানুষ।

ক্ষোভে-দুঃখে নিজের হাত কামড়াচ্ছেন ঢাকাস্থ আমেরিকানরা। এর মধ্যে ইউএস এআইডি-র মিশন পরিচালকও আছেন।

তাঁরা সমবেত হলেন এবং বললেন, মানবতার ওপর এই আঘাত আমরা চুপচাপ মেনে নিতে পারি না। আমাদের কি বিবেক বলে কিছু নাই?

তাঁরা, ২০ জন আমেরিকান, তাঁদের মধ্যে আছেন ইউএসআইএসের প্রধান, আছেন এইডের প্রধান, আর্চার কে ব্লাডের ডেপুটি, আছেন অর্থনীতি, কনসুলার ও প্রশাসনের প্রধানেরা, একসাথে বসে একটা বিবৃতি তৈরি করলেন।

নিক্সন সরকার ভিয়েতনাম বিপর্যয়ের পর একটা নতুন নিয়ম চালু করেছে। আমেরিকান সরকার যদি কোনো ভুল নীতি গ্রহণ করে, কোনো সরকারি কর্মকর্তার যদি মনে হয় এটা ভুল, তাহলে সে তার আপত্তি জানাতে পারবে। ডিসেন্ট চ্যানেল বা ভিন্নমত প্রকাশের একটা চ্যানেল খোলা হয়েছে। এই ২০ অফিসার ঠিক করলেন তাঁরা ভিন্নমত প্রকাশ করবেন। পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে আমেরিকান সরকার বড় ভুল করছে, অন্যায় করছে, তাঁরা তার প্রতিবাদ না করে থাকতেই পারেন না।

তাঁরা একটা বিবৃতি মুসাবিদা করলেন।

২০ জন মার্কিন কর্মকর্তা স্বাক্ষরিত ওই টেলিগ্রাম 'ডিসেন্ট ফ্রম ইউএস পলিসি টুয়ার্ড ইস্ট পাকিস্তান: জয়েন্ট স্টেট/এইড/ইউএসআইএস মেসেজ।'

তাঁরা বললেন, আমেরিকার সরকার গণতন্ত্রকে দলিত-মথিত করার ঘটনাকে নিন্দা জানাতে ব্যর্থ হয়েছে।

তাঁরা বললেন, তাঁদের সরকার ব্যর্থ হয়েছে নৃশংসতার নিন্দা করতে।

তাঁরা বললেন, তাঁদের সরকার গণহত্যাকে অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ঘটনা বলে গণ্য করছে। এবং নিপীড়নকারীদের সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। এটা চরম দেউলেপনা। এখানকার বেসরকারি আমেরিকানরা আমেরিকান সরকারের ওপর চরম বিরক্ত। আমরা আমাদের ভিন্নমত প্রকাশ করছি।

আর্চার ব্লাড সেই বিবৃতিকে সমর্থন করে নিজের কথাও লিখলেন।

এবং এ কথাও লিখলেন যে, বাঙালিদের এই লড়াইয়ের ফল হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। পরাজিতদের পক্ষ নেওয়া হবে চরম বোকামি।

আর্চার ব্লাড জানেন, এটার প্রতিক্রিয়া তাঁর চাকরিজীবনের জন্য ভালো হবে না। কিন্তু একটা সময় আসে, যখন মানুষকে জীবিকার চেয়ে বিবেকের দিকেই বেশি তাকাতে হয়।

তিনি টেলিগ্রামটা পাঠিয়ে দিলেন ওয়াশিংটনে, পাকিস্তানের আমেরিকান দূতাবাসে এবং দিল্লিতে।

সচেতনভাবে এটাকে কম গোপনীয় হিসেবে দেখানো হয়।

নিক্সন আর হেনরি কিসিঞ্জার খুব খেপে গেলেন। এটা এখন সংবাদমাধ্যমে চলে যাবে, আর চলে যাবে কেনেডিদের কাছে, এই ছিল তাঁর রাগের কারণ।

তাঁরা আর্চার ব্লাডকে পাগল বলে গালিগালাজ করতে লাগলেন।

কিন্তু এই টেলিগ্রামও নিক্সন ও কিসিঞ্জারকে তাঁদের ইয়াহিয়া-প্রীতি থেকে নড়াতে পারল না।

প্রেম কি তাতে কমে? বরং আরও বেড়েই গেল।

শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের কারাগারে রাখা হয়েছে।

তাজউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, কামারুজ্জামান, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক ভারতে চলে গেছেন। সেখানে তাঁরা গঠন করেছেন বাংলাদেশ সরকার। তৈরি করেছেন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। মুক্তিবাহিনী গঠিত হয়েছে। বাঙালি সৈন্য, ইপিআর, পুলিশ, ছাত্র, শিক্ষক, বিভিন্ন পেশাজীবী হাজার হাজার মানুষ ভারতে গিয়ে

মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ নিচ্ছে এবং বাংলাদেশের ভেতরে ঢুকে দখলদার পাকিস্তানি সৈন্যদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। মুক্তিবাহিনী দেশকে কয়েকটা সেক্টরে ভাগ করে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি গঠিত হয়েছে বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী। নৌকমান্ডোরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে অভিযান চালিয়ে ডুবিয়ে দিচ্ছে পাকিস্তানি জাহাজ।

পাকিস্তানি বাহিনী পোড়ামাটি নীতি অনুসরণ করছে। তারা জ্বালিয়ে দিচ্ছে ঘরবাড়ি, হত্যা করছে নির্বিচারে, তাদের অত্যাচারে প্রায় এক কোটি মানুষ দেশত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছে ভারতে, শরণার্থী শিবিরে যাপন করছে মানবেতর জীবন।

পাকিস্তানিরা বলছে, পূর্ব পাকিস্তান তাদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আছে, সবকিছু চলছে স্বাভাবিক, এই প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে। তারা গঠন করেছে রাজাকার, আলবদর, আলশামস বাহিনী, তাতে যোগ দিয়েছে ইসলাম-পসন্দ দলগুলোর কর্মীরা, কখনো কখনো তাদের অত্যাচার হার মানাচ্ছে পাকিস্তানি সৈন্যদের নৃশংসতাকেও। লাখ লাখ মানুষ মারা যাচ্ছে। নারীরা হচ্ছে ধর্ষিত।

প্রথমে কিসিঞ্জার গেলেন ভারতে। কারণ, পাকিস্তানে যেতে হলে ভারত হয়ে যেতে হয়, এইটাই দুনিয়ার নিয়ম। ভারতের মাটি স্পর্শ না করে কেউ পাকিস্তানে যেতে চায় না। যতই নিক্সন আর কিসিঞ্জার ইন্দিরা গান্ধীকে 'দেমাগি' আর 'বিচ' বলে গালি দিক না কেন।

সেখান থেকে তিনি গেলেন পাকিস্তানে।

ইয়াহিয়ার সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি দেখা হয়, ওয়ান টু ওয়ান। রাওয়ালপিন্ডির কাছে, প্রেসিডেন্ট ভবনে। পুলিশেরা যাকে বলে 'পতিতালয়'।

ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণ নিক্সনকে কিসিঞ্জার এইভাবে দেবেন—

কিসিঞ্জার বলেন, 'ইয়াহিয়া কোনো প্রতিভাবান নন।'

'আচ্ছা।' নিক্সন ভাবলেশহীনভাবে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন।

'এটা আমার ধারণা যে, ইয়াহিয়া এবং তাঁর সঙ্গীরা আইকিউয়ের জন্য কোনো পুরস্কার পাবেন না। কিংবা তাঁদের রাজনৈতিক বোধের জন্যও না। তাঁরা অনুগত, মাথামোটা সৈনিক।'

'হুঁ।'

'কিন্তু তাদের সত্যিকারের বুদ্ধিগত সমস্যা আছে, তারা বোঝে না কেন পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের অংশ থাকতে পারে না।'

'কী রকম?'

'ইয়াহিয়া এবং তাঁর সহকর্মীরা এটা বুঝতেও পারেন না যে ভারত তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধের পরিকল্পনা করছে।'

'আচ্ছা।'

'আর যদি যুদ্ধ বাধেও, তাহলে তাঁদের ধারণা তাঁরাই জয়লাভ করবেন।'

'তাই নাকি। কীভাবে?'

'এই প্রশ্নটাই আমি তাঁদের করেছিলাম। আপনারা কেন ভাবছেন যে আপনারা ভারতের বিরুদ্ধে বিজয়ী হবেন। ভারত তো সব সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রবলে আপনাদের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে। তখন তাঁরা কী বললেন জানেন?'

'কী বললেন?'

'বললেন যে ঐতিহাসিকভাবে মুসলিম সৈন্যরা উন্নততর।'

'হুঁ।'

'তারপর আমি বললাম আমার পেটব্যথা। ডিনারের সময় বললাম। তখন ইয়াহিয়া চিৎকার করতে লাগলেন, "সবাই বলে আমি একজন একনায়ক।" তিনি প্রতিটা টেবিলে গেলেন, প্রত্যেক অতিথিকে ধরে ধরে জিগ্যেস করতে লাগলেন, "অ্যাম আই আ ডিক্টেটর। আমি কি একজন স্বৈরশাসক?"

'তিনি আমার কাছেও এলেন। আমাকে বললেন, "মিস্টার কিসিঞ্জার,

আমি কি একজন ডিক্টেটর?"

'আমি বললাম, আমি তো জানি না। তবে এইটা আমি জানি, আপনি এমন একটা নির্বাচন করেছেন, যেটা একজন ডিক্টেটরের জন্য খারাপ।'

কিসিঞ্জারের পেটব্যথা খুবই বেড়ে গেল।

তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে নাথাইগলিতে।

এর আগে আমেরিকান নিরাপত্তাকর্মীরা জায়গাটা ঘুরে গেছেন। তাঁরা সেখানে যাওয়ার পথে উট দেখে লাফিয়ে উঠেছিলেন, উট উট। ভালুক দেখে তো তাঁরা অজ্ঞান, ভালুক ভালুক।

ভোজসভা শেষে সব অতিথিকে বিদায় করে দিয়ে অতি গোপনে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলো রাওয়ালপিন্ডির বিমানবাহিনী সাইটে। সেখান থেকে তিনি পিআইএর একটা বিমানে চড়ে উড়ে গেলেন।

কিন্তু সবাই জানল যে তিনি প্রেসিডেন্ট হাউসেই আছেন। তাঁর পেটে ব্যথা।

তাঁর এত পেটব্যথা যে তাঁকে নাথাইগলিতে বিশ্রামে রাখতে হবে। মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে নিয়ে মোটর শোভাযাত্রা রওনা হলো নাথাইগলির দিকে।

কিসিঞ্জার পৌঁছালেন পিকিংয়ে।

এদিকে নাথাইগলিতে একজন নিরাপত্তাকর্মী সত্যি সত্যি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে দেখানোর জন্য অ্যাবোটাবাদ থেকে একজন ডাক্তার ডেকে আনা হলো।

তিনি রোগী দেখার পর বললেন, 'কিসিঞ্জার কই।'

তাঁকে বলা হলো, 'আছেন। আপনার জানার দরকার নাই।'

'তিনি অসুস্থ। আমি ডাক্তার। আমি অবশ্যই কিসিঞ্জারকে দেখব।'

'না না। দেখা চলবে না।'

'ওই ঘরেও তো কাউকে দেখা যাচ্ছে না। তাহলে কি কিসিঞ্জার নিখোঁজ!'

তিনি নিজ দায়িত্বে এসপিকে বললেন, 'কিসিঞ্জার নিখোঁজ হয়েছে।'

এসপি ভাবলেন এত বড় খবরটা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো দরকার।

তখন সেই এসপিকে হাতে-পায়ে ধরে থামানো হলো। 'কিসিঞ্জার

কোথায় গেছে, এটা রাষ্ট্রীয় গোপন তথ্য। এটা নিয়ে কোনো কথা বললে আপনার চাকরি যাবে।'

সবার ধারণা কিসিঞ্জার গেছেন বন্দী শেখ মুজিবের সঙ্গে গোপন বৈঠক করতে।

তবে একজন পাকিস্তানি সাংবাদিক খবরটি লন্ডনের *ডেইলি টেলিগ্রাফ* অফিসে পাঠালেন—কিসিঞ্জার চীনে। *ডেইলি টেলিগ্রাম* খবরটি গাঁজাখুরি হিসেবে বাজে কাগজের ঝুড়িতে দিল ফেলে।

তিন দিন পর কিসিঞ্জার ফিরে এলেন একই প্লেনে।

কিসিঞ্জারের সঙ্গে চীনের প্রধানমন্ত্রীর কী কথা হলো।

কিসিঞ্জার বললেন, 'মিস্টার প্রাইম মিনিস্টার, আমরা ভারতকে সামরিক সরঞ্জাম দিই না।'

'হ্যাঁ। আমি তাই শুনেছি। কিন্তু আপনারা পাকিস্তানকে কিছু অস্ত্র দিচ্ছেন।'

'হ্যাঁ। আপনারাও তো তা-ই করেন।'

চৌন এন লাই বললেন, 'তথাকথিত বাংলাদেশ সরকারের হেড কোয়ার্টার ভারতে। এটা কি পাকিস্তান সরকারের জন্য ক্ষতিকর নয়?'

'আপনি জানেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে আমরা খুব পছন্দ করি। আমরা তাঁর এবং তাঁর দেশের জন্য গভীর বন্ধুত্ব অনুভব করি।'

চৌ এন লাই বললেন, 'দয়া করে ইয়াহিয়া খানকে বলবেন, যদি ভারত কোনো আগ্রাসন চালায় তাহলে আমরা পাকিস্তানের পক্ষ নেব। আপনারাও তো তা-ই নেবেন।'

'আমরা অবশ্যই ভারতীয় আগ্রাসনের বিরোধিতা করব। কিন্তু সামরিক দিক থেকে আমাদের কিছু করার নাই।'

'আপনারা তো অনেক দূরে।'

'হ্যাঁ। আমরা ১০ হাজার মাইল দূরে।'

'আপনারা ভারতকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করুন।'

'চীন তো কাছে।'

'হ্যাঁ। আমরা ১৯৬২-এর যুদ্ধে ভারতকে হারিয়ে দিয়েছিলাম। সেটা আমরা আবার করতে পারি।'

চীন নিক্সনকে আমন্ত্রণ জানাবে এমনি কথার মধ্য দিয়ে কিসিঞ্জার প্লেনে

উঠলেন। তাঁকে দেওয়া হলো অনেক চীনা ফল, মাও সে তুংয়ের বইয়ের ইংরেজি অনুবাদ। এবং এই ট্রিপের ফটো অ্যালবাম।

কিসিঞ্জার হাসতে হাসতে বললেন, 'আপনাদের দেশে অনেক বিদেশি এসেছে, আগ্রাসন করেছে। কিন্তু আমার মতো এত অসভ্যভাবে বোধ হয় আর কেউ আসেনি।'

ভারত অপেক্ষা করছিল চীন-ভারত সীমান্তে তুষারপাতের জন্য। শীত এসে গেছে। চীন-ভারত সীমান্ত এখন অগম্য। এর মধ্যে রাশিয়ার সঙ্গেও তার চুক্তি হয়ে গেছে। ভারত বা রাশিয়া কোনো তৃতীয় দেশ আক্রমণ করলে উভয় দেশই তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে।

ইন্দিরা গান্ধী ওয়াশিংটন সফরে এসেছিলেন।

এর চেয়ে খারাপ সফর আর কিছু হতে পারে না।

নিক্সন আর কিসিঞ্জার পরের দিন এই নিয়ে আলোচনা করেছেন। কথাবার্তা এমন ছিল, 'আগেই বলিনি, ইন্দিরা একটা কুত্তী।'

নিক্সন ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছেন, 'তাঁরা পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করেন না, তাঁরা ইয়াহিয়াকে বলেছেন পূর্ব পাকিস্তানি নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে, তাঁরা শরণার্থীদের মানবিক সাহায্য দিতে থাকবে। কিন্তু ভারত যদি পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধায় তার পরিণতি খুব খারাপ হবে। সুপার পাওয়ারগুলো নাক গলাবে। আমরা কিন্তু চীনের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করছি।'

ইন্দিরা গান্ধীও জানিয়ে দেন, 'আমরা রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করেছি।'

কিসিঞ্জার ভারতের প্রধান সচিব হাকসারকে, যাঁকে তিনি আড়ালে ডাকেন একজন ক্লাউন বলে, বলেছেন, 'গত তিন মাসে তোমরা কী করেছ, সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছ আমরা তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু,

ক্রমাগতভাবে আমাদের গালিগালাজ করেছ, রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করেছ আর কেনেডিকে নিয়ে গেছ ভারতে। এখন এসে আমাদের বলছ সব সমস্যার সমাধান করব আমরা। যাও।'

খুব মন খারাপ করে আমেরিকা থেকে উড়াল দিলেন ইন্দিরা গান্ধী। আমেরিকা তাঁকে এত অপমান করতে পারল?

ঠিক আছে। আমিও এর শোধ নেব। আমিও আমার বাবারই মেয়ে।

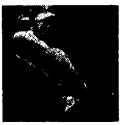

নেহরুর মেয়ে ইন্দিরা আসলেই বাপেরই বেটি।

মুক্তিবাহিনী একযোগে আক্রমণ করে বসল অবরুদ্ধ বাংলাদেশের সীমান্তে। চারদিকে। তাদের সঙ্গে রইল ভারতীয় বাহিনী।

চীনাদের একটা সামরিক প্রতিনিধিদল তখন ছিল ইসলামাবাদে। তারা বলল, পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান করো।

সামরিক কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক পদক্ষেপ নিল। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা হলো নুরুল আমিনকে। আওয়ামী লীগের বাইরে মাত্র যে দুজন এমএনএ নির্বাচিত হয়েছেন, নুরুল আমিন তাঁদের একজন। ভুট্টোকে করা হলো উপপ্রধানমন্ত্রী। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও তাঁকে দেওয়া হলো। গভর্নর করা হলো ডা. এ এম মালিককে।

কিন্তু তাতে লাভ হলো না।

ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিল।

পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা করল।

কিন্তু দ্রুতই মুক্তিবাহিনী আর মিত্রবাহিনী বাংলাদেশে ঢুকে দখল করে নিতে লাগল একের পর এক শহর। সবচেয়ে বড় কথা, যেখানে যেখানে পাকিস্তানি সৈন্যরা বড় ঘাঁটি করে অপেক্ষা করছে শত্রুর, সেসব এলাকা এড়িয়ে তারা এগিয়ে যেতে লাগল রাজধানী ঢাকার

দিকে। দ্রুত।

পাকিস্তানিরা পাগল হয়ে গেল। বারবার করে সাহায্য চাইতে লাগল আমেরিকার কাছ থেকে। চীনের কাছ থেকে।

কিসিঞ্জার ছুটে গেলেন নিউ ইয়র্কে। সঙ্গে নিলেন চীন বিশেষজ্ঞ হেইগ ও উইনস্টনকে। জর্জ ডব্লিউ বুশকে ডেকে আনা হলো নিউ ইয়র্কে, সিআইএর একটা নিরাপদ ভবনে। বুশ এলেন, এলেন কিসিঞ্জার ও সঙ্গীদ্বয়। এলেন জাতিসংঘে নিযুক্ত চীনের দূত হুয়াং হু। কিসিঞ্জার বললেন, এটা খুব গোপন বৈঠক।

কিসিঞ্জার জানালেন, 'আমাদের আইনে আমরা পাকিস্তানকে অস্ত্র দিতে পারি না। তা সত্ত্বেও আমরা জর্দানের মাধ্যমে পাকিস্তানকে যুদ্ধবিমান পাঠাচ্ছি।'

শেষে ভণিতা না করে বললেন, 'আমেরিকা চায়, উপমহাদেশের পরিস্থিতিতে চীন কিছু করুক। সামরিকভাবে যুক্ত হোক।'

কিসিঞ্জার দৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস নিয়ে গেলেন যে চীন সৈন্য মোতায়েন করতে যাচ্ছে।

এই নিয়ে কিসিঞ্জার আর নিক্সনের মধ্যে যে ধরনের কথা হয়—

'চীনকে বলো ভারত আক্রমণ করতে।'

'তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীন আক্রমণ করতে পারে।'

'করবে।'

'সে ক্ষেত্রে আমাদের সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিষ্ক্রিয় করতে হতে পারে।'

'করব।'

'সে ক্ষেত্রে আণবিক বোমা ব্যবহার করতে হতে পারে।'

'হলে হবে।'

শেহেরজাদি বলল, 'বাদশাহ, বুঝলেন কিছু! ইয়াহিয়ার জন্য নিক্সনের প্রেমের কারণে সম্পূর্ণ একটা অন্যায় যুদ্ধে লাখ লাখ মানুষ নিহত হওয়ার পরও নিক্সন ও কিসিঞ্জার আণবিক যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হলেন। চীনকে বললেন, ভারত আক্রমণ করো। আর দরকার হলে আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নিউক্লিয়ার বোমা ব্যবহার করব।'

সুলতান শাহরিয়ার বললেন, 'তারপর কী হলো? চীন কি ভারত আক্রমণ করল?'

'না।'

'চীন বলে দিল, তারা ভারত আক্রমণ করবে না। লাখ লাখ সোভিয়েত সৈন্য এগিয়ে আসছে চীনের দিকে। এটা তারা হতে দেবে কেন। এই দুঃস্বপ্ন কেন তারা ডেকে আনবে?'

চীন থেকে পাকিস্তানের সাহায্যে কোনো সৈন্য এল না।

পাকিস্তানিরা মাথার চুল ছিঁড়তে লাগল।

ইয়াহিয়া খান সকাল থেকেই হুইস্কির ওপরেই আছেন। বেনসন হেজেসও চলছে। তিনি পীরজাদাকে বললেন, 'একটা সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করো। সব বিদেশি সাংবাদিককে ডাকবে। দেশি সাংবাদিকগুলো সব হারামজাদা।'

বিদেশি সাংবাদিকেরা এলেন। নামকরা হোটেলে হচ্ছে এই সংবাদ সম্মেলন। আজকে প্রেসিডেন্ট পরেছেন তাঁর সামরিক পোশাক। তিনি সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কও তো বটেন।

তাঁর মেডেলগুলো এসির বাতাসে উড়ছিল আর টুংটাং শব্দ করছিল।

তাঁর এক পাশে জেনারেল গুল হাসান। আরেক পাশে পীরজাদা।

প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আমি ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে যাচ্ছি। আর কত উসকানির মুখে আমরা নীরব থাকতে পারি। আপনাদের সঙ্গে আর আমাদের দেখা হবে না। ১০ দিনের মধ্যেই আপনারা আমাকে দেখবেন আমি ফ্রন্টে। শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করছি। আমরা তো জিহাদ করি। আমাদের জয় তাই অবশ্যম্ভাবী।'

লাহোরের পত্রিকা *মাশরিক*-এ ছাপা হলো ব্যানার শিরোনাম :

'ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ অনিবার্য। ঘোষণা দিলেন প্রেসিডেন্ট : আমি ১০ দিনের মধ্যেই ফ্রন্টে যাব।'

ফ্রন্টে গেলে তিনি খারাপ করতেন না। মকবুলপুর ফ্রন্টে বাংকারে বাংকারে ছিল নারী। আকাশ থেকে ঝরছিল ভারতীয় গোলা। আর ভেতরে নারীদের সঙ্গ উপভোগ করছিলেন ব্রিগেডিয়ার হেদায়াতুল্লাহ। প্রেসিডেন্ট সেখানে গেলে তাঁর প্রতিদিনের অভ্যস্ত জীবনের বাইরের কোনো জীবন পেতেন না। বরং যুদ্ধক্ষেত্রে গোলাগুলির নিচে নারীদের সঙ্গে মিলিত হতে তাঁর ভালোই লাগত।

ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা হয়ে গেছে।

ভারতীয় সৈন্যরা বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে নিয়ে একে একে শত্রুমুক্ত করছে বাংলাদেশের জনপদগুলো।

লাহোরে একটা হোটেলে আয়োজিত এক পার্টিতে যোগ দিলেন ইয়াহিয়া। সেখানে গান হচ্ছে, নাচ হচ্ছে, আলো জ্বলছে-নিভছে। একটার পর একটা গেলাস হাতে নিচ্ছেন ইয়াহিয়া। একেকজন নারীর কোমর ধরে দুলছেন।

তারপর হঠাৎ খেপে গেলেন। হাতের জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলেন ফোলানো সব রঙিন বেলুনের দিকে।

তিনি একটা বেলুনের গায়ে জ্বলন্ত সিগারেট চেপে ধরতেই সেটা ফটাস করে গেল ফুটে। তিনি হো হো করে হাসতে হাসতে বললেন, 'এই মাত্র ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রামকে শেষ করলাম। এবার মানেকশকে খতম করব।' তিনি আরেকটা বেলুন ফাটালেন, 'এইবার শেষ করলাম ইন্দিরাকে। সবশেষ ফাটাব মুজিবকে।' একটা বেলুনের দিকে জ্বলন্ত সিগারেট নিয়ে এগিয়ে গেলেন। চিৎকার করে উঠলেন, 'মুজিব শেষ। মুজিব শেষ।'

তিনি তাঁর হাতের সিগারেটটায় শেষ টান দেওয়ার জন্য ঠোঁটে চাপতেই চিৎকার করে উঠলেন। মাতাল হাতে তিনি সিগারেটের জ্বলন্ত অংশ ধরেছেন ঠোঁটে। তাঁর ঠোঁট পুড়ে যাচ্ছে। শেখ মুজিবকে মারতে গিয়ে তিনি নিজেই পুড়িয়ে ফেললেন তাঁর মুখ।

সব শত্রুকেই তিনি ঘায়েল করেছেন। বীর জেনারেল। এখন তিনি

রণক্লান্ত। এবার শান্ত হবেন। এবার তাঁর দরকার বিনোদন। তিনি নুরজাহানকে নিয়ে একটা কক্ষে ঢুকে পড়লেন।

ঢাকার গভর্নর হাউস। গভর্নর এ এম মালিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ডেকেছেন। তাঁর সঙ্গে আছেন পাকিস্তানি বেসামরিক প্রশাসনের প্রধান জেনারেল রাও ফরমান আলী।

যুদ্ধের পরিস্থিতি কী, এটা গভর্নরকে জানানো হবে। কাজেই প্রদেশের কমান্ডার জেনারেল নিয়াজি ওরফে টাইগার এখানে উপস্থিত হলেন।

পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে দুজন টাইগার ছিলেন। একজন সিনিয়র টাইগার। আরেকজন জুনিয়র টাইগার। সিনিয়র টাইগার ছিলেন আতাউল গনি ওসমানী। তিনি এখন মুক্তিবাহিনীর সেনাপ্রধান। কলকাতা থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করছেন। তিনি নিয়াজিকে সম্বোধন করতেন জুনিয়র টাইগার হিসেবে।

গভর্নর ড. এ এম মালিকের সামনে বসলেন রাও ফরমান আলী খান, নিয়াজি এবং চিফ সেক্রেটারি মুজাফফর হোসেন।

গভর্নর বললেন, 'দুটো পক্ষ যুদ্ধ করবে, এক পক্ষ জিতবে, আরেক পক্ষ হারবে। এই তো স্বাভাবিক। কোনো একটা সময় একজন কমান্ডারকে আত্মসমর্পণ করতে হতে পারে...'

আত্মসমর্পণ কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে টাইগার নিয়াজি বাঘ থেকে বিড়ালে পরিণত হলেন। তিনি মিউ মিউ করে কাঁদতে লাগলেন, যেমন করে দুটো বিড়াল রাতের বেলায় গোঙাতে থাকে। তাঁর মুখ বিকৃত হয়ে উঠল, তাঁর দুই চোখ দিয়ে দরদরিয়ে পানি পড়ছে, তিনি ফোঁপাচ্ছেন, গোঙাচ্ছেন, চিৎকার করছেন।

এই সময় চা নিয়ে প্রবেশ করল পরিচারক। মুজাফফর উঠে দাঁড়ালেন,

বললেন, 'তুমি কেন এসেছ? এটা চা খাওয়ার সময়। ভাগো?'

পরিচারক বাইরে গেল। মিলিটারি সেক্রেটারি ও অন্য কর্মকর্তারা তাঁকে বললেন, 'কী হয়েছে?'

পরিচারক বলল, 'সাহেবরা কান্নাকাটি করছে।'

এই খবর সমস্ত শহরে ছড়িয়ে পড়ল। সারা শহরের মানুষ উল্লসিত। পাকিস্তানপন্থীরা হয়ে পড়ল আতঙ্কিত।

ডিসেম্বর ৯। ১৯৭১। নিয়াজি পশ্চিম পাকিস্তানে বার্তা পাঠালেন। তাতে তিনি জানালেন, সারা দেশে অবস্থা খারাপ। আকাশে ভূমিতে মার খেতে খেতে তারা চিড়াচ্যাপ্টা। গোলাবারুদ শেষ হয়ে গেছে। সৈন্যও নাই। চারদিকে সৈন্যরা বিচ্ছিন্ন। কেউ বাংকার থেকে বের হচ্ছে না। আর যুদ্ধ চালাব কী করে?

এরপর গভর্নর এ এম মালিক ইয়াহিয়ার কাছে বার্তা পাঠালেন, 'আশু যুদ্ধবিরতি ও রাজনৈতিক মীমাংসার বিবেচনার জন্য আপনার অনুমতি চাচ্ছি।'

ইয়াহিয়া তখন বসে আছেন হুইস্কি নিয়ে। তাঁর সামনে হামিদ আর পীরজাদা।

ইয়াহিয়া বললেন, 'কী করব?'

হামিদ মদে চুরচুর। বললেন, 'আরে পূর্ব পাকিস্তান গোল্লায় যাক। বাঙালিরা মরুক গে। আপনি শুধু আমাদের সৈন্যদের নিরাপদে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে আসার ব্যবস্থা করুন।'

ইয়াহিয়া বললেন, 'ঠিক হ্যায়। বার্তা রেডি করো। বলো, ওরা খুব ভালো যুদ্ধ করেছে। তাদের অভিনন্দন। এখন যুদ্ধ থামাও। গভর্নর স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিক। তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। আমরা বরং আরেকটু পান করি। পার্টি অ্যারেঞ্জ করো। আমি পার্টি করব।'

ঢাকায় নিয়াজির ঘুম হারাম হয়ে যায়। কিন্তু মুখ খুলে যেতে থাকে। তিনি পৃথিবীর কুৎসিততম কৌতুকগুলো বলতে থাকেন।

নিয়াজি জানেন, তিনি এখন আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছেন। এ এম মালিকের পক্ষ থেকে জাতিসংঘ প্রতিনিধিদের কাছে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। শর্ত দুটো, পাকিস্তানি সৈন্যদের পাকিস্তানে ফেরত

পাঠানোর ব্যবস্থা করা। বিহারিদের মধ্যে যারা যেতে চায়, তাদের পাকিস্তানে যেতে দেওয়া। আর কোনো প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা যেন কারও বিরুদ্ধে না নেওয়া হয়।

ইয়াহিয়া এ এম মালিককে অনুমতি দিয়েছেন এগিয়ে যাওয়ার জন্য, যেন আর কোনো প্রাণহানি না ঘটে।

রাও ফরমান আলী প্রমুখ একবার ছুটে যাচ্ছেন জাতিসংঘ প্রতিনিধির কাছে, একবার আমেরিকান কনসাল জেনারেলের কাছে, একবার রাশিয়ান দূতাবাসে। আমাদের পশ্চাদ্দেশ রক্ষা করো। তবে মুখে বলছেন, 'বেসামরিক লোকদের জীবন বাঁচান। আমরা আর যুদ্ধ করব না। আওয়ামী লীগের এমএনএ খুঁজে বের করে তাদের হাতে ক্ষমতা দেব। আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানে পালানোর ব্যবস্থা করো, ভাই।'

কিন্তু তবু পাকিস্তান থেকে সংকেত আসছে, চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও, হলুদ আসছে উত্তর দিক থেকে, আর সাদা আসছে দক্ষিণ দিক থেকে।

চীন আসছে, আমেরিকা আসছে।

পাকিস্তানি সৈন্যরা আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। কেউ কি এল? চীনারা? আমেরিকানরা?

টাঙ্গাইলে দেখা গেল আকাশ থেকে নামছে হাজার হাজার প্যারাট্রুপার। ভারতীয় সৈন্য। তারা ঢাকার দিকে রওনা হয়েছে। তাদের সামনে কাদের সিদ্দিকী।

গভর্নর হাউসে একটা সভা হওয়ার কথা। সেই সভায় সবাই যোগ দেবেন।

গভর্নর ডাক্তার মালিক। কলকাতায় ছিলেন বিখ্যাত সার্জন। ডাক্তার হিসেবে তিনি একটা নতুন রোগ নিজের ভেতরে আবিষ্কার করলেন। আইবিএস। ইরিটেবল বাউল সিনড্রম। যখন-তখন বাথরুম পায়। পেটের ভেতরটা মোচড় দেয়।

সভার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন। বাইরে ভীষণ কাক ডাকছে। পেটের ভেতরটাও গুড়গুড় করছে।

হঠাৎ গুড়ুম গুড়ুম।

তাঁর পুরো গভর্নর ভবন যেন মাটিতে মিশে যাবে?

তিনি বললেন, 'কী হচ্ছে?'

'বোমা পড়ছে।'

'কারা বোমা মারছে। চীনারা?'

'না স্যার। ভারতীয় বিমান।'

গভর্নর হাউসেই ছিল রাও ফরমান আলীর অফিস। সেখানে বোমা পড়ল। লাইব্রেরিতে আগুন লেগে গেল। এ এম মালিক দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন এবং মাটির নিচের গর্তে আশ্রয় নিলেন। এ সময় তাঁর পেট ব্যথা করে উঠল। এটাই আইবিএসের লক্ষণ। অসময়ে বাথরুম পায়।

তিনি সেদিনই পদত্যাগ করে গভর্নর হাউস ছেড়ে গেলেন। আশ্রয় নিলেন ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে। এটা 'নো ওয়ার জোন'। রেডক্রসের পতাকা টাঙানো। তাঁর সঙ্গে পুরো মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে আশ্রয় নিলেন সেই হোটেলে।

এরই মধ্যে ভারতীয় বিমান থেকে ঢাকার আকাশে বৃষ্টির মতো লিফলেট ছড়ানো হলো। 'আত্মসমর্পণ করো। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী তোমাদের যুদ্ধবন্দীর মর্যাদা ও নিরাপত্তা দেওয়া হবে। তা না হলে মুক্তিযোদ্ধারা তোমাদের ছিঁড়ে খাবে।'

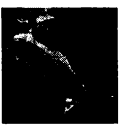

১৫ ডিসেম্বর রাতে মদের মধ্যে ডুবে থাকতে থাকতে তিনি হঠাৎ ভেসে উঠলেন। বললেন, 'রেডিও-টিভিকে খবর দাও। আমি এখনই আমার বিশেষ ক্ষমতাবলে নতুন সংবিধান ঘোষণা করব। পাকিস্তান হবে ইসলামিক দেশ। এই দেশ আজ থেকে ইসলামিক রাষ্ট্র। ব্যস।' বলেই তিনি বমি করতে লাগলেন। বমির দুর্গন্ধে রাষ্ট্রপতিতালয় ভেসে যেতে লাগল।

১৬ ডিসেম্বর। জেনারেল গুল হাসান দাঁড়িয়ে আছেন ইয়াহিয়ার খাস

কামরার দরজায়। প্রেসিডেন্ট বের হচ্ছেন না। এবার আর আকলিমকে আনা হলো না। গুল হাসান নিজেই ঢুকে পড়লেন ভেতরে। প্রেসিডেন্ট তখনো বসে বসে মদ খাচ্ছেন।

'স্যার। আপনাকে রেডিওতে যেতে হবে।'

'কেন?'

'স্যার, আপনাকে একটা ভাষণ দিতে হবে।'

'শোনো, থার্টি ফার্স্টে আমি রাওয়ালপিন্ডির রাস্তায় মানেকশকে দিয়ে প্যারেড করব। জ্যাকবকে প্যারেড করাব। জগজীবনকে কোমরে দড়ি বেঁধে রাস্তায় ঘোরাব।'

'স্যার। আপনাকে উঠতে হবে, স্যার।'

জেনারেল হামিদও এলেন, 'স্যার প্লিজ।'

'হামিদ। এসো, তুমিও খাও। তোমার মনে আছে আমরা লারকানায় ভুট্টোর বাগানবাড়িতে কত মদ খেয়েছিলাম। সেদিনই তো আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, মুজিবকে আমরা ক্ষমতা দেব না। আলোচনা সব লোক-দেখানো। মনে আছে। তোমরা দুজনে আমাকে রাজি করিয়েছিলে? মনে আছে?'

'স্যার। এই সব মনে রাখার সময় আর নাই। পূর্ব পাকিস্তানের পতন ঘটে গেছে। আপনি অনুমতি দিয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানে আমরা সারেন্ডার করতে যাচ্ছি। নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ।'

হামিদের চোখে অশ্রু।

'হামিদ তুমি কাঁদছ কেন?'

'আমি সেনাবাহিনী-প্রধান। আমার সৈন্যরা সারেন্ডার করছে, আমি কি হাসব?'

'গুল হাসান। তুমি কী মনে করো? কোনো মরদ লোক কাঁদতে পারে?' ইয়াহিয়া বললেন।

'না স্যার।' গুল হাসান নিজেই কাঁদতে শুরু করলেন।

ঢাকার কাছেই মিরপুর সেতুর কাছে অবস্থান নিয়েছেন ভারতীয় মেজর জেনারেল নাগরা।

তিনি নিয়াজিকে একটা চিরকুট পাঠিয়েছেন, 'প্রিয় আবদুল্লাহ, আমি মিরপুরে তোমার জন্য বসে আছি। তুমি কি আমাকে অভ্যর্থনা জানাতে লোক পাঠাবে?'

নিয়াজি তাঁকে অভ্যর্থনা করে তাঁর হেডকোয়ার্টারে নিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে আছেন কাদের সিদ্দিকী। লোকে তাঁকে ডাকে বাঘা সিদ্দিকী বলে। নিয়াজি তাঁর অতিথিদের বিনোদিত করতে বলা শুরু করলেন অশ্লীলতম কৌতুক।

এরই মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলের চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জ্যাকব এসে পৌঁছেছেন ঢাকায়। নিয়াজির সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ করবেন। মেন্যুতে আছে মুরগির রোস্ট। পাকিস্তানি সৈন্যরা নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে মুরগির হাড় চিবুচ্ছে, জ্যাকব খেয়াল করলেন।

চিকেন এদের প্রিয় খাবার। দে লাভ চিকস। নিয়াজির কৌতুকের মধ্যেই আছেন। তিনি বলছেন, 'আচ্ছা নাগরা, বলুন তো, মোরগের হাত নাই কেন?'

'কেন?'

'মুরগির স্তন নাই বলে।'

ঢাকায় দুপুর গড়িয়ে পড়ছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার অরোরা সিং, তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর আরও কিছু সেনাকর্তা সঙ্গী ঢাকা এয়ারপোর্টে নামলেন। সঙ্গে আছেন মুক্তিবাহিনীর ডেপুটি চিফ অব স্টাফ এ কে খন্দকার।

তাঁদের বরণ করতে ছুটে এসেছেন নিয়াজি আর জ্যাকব। রাস্তায় রাস্তায় মুক্তিবাহিনী তাঁদের বাধা দিচ্ছে। মুক্তিরা বলছেন, 'নিয়াজিকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন।'

জ্যাকবের লোকেরা বলল, 'ও আমাদের যুদ্ধবন্দী। তোমরা সরো।'

মিসেস অরোরা সিং হাসিভরা মুখে ঢাকার আকাশ আর প্রকৃতি দেখছিলেন।

জ্যাকব নির্দেশ দিলেন নাগরাকে, 'রেসকোর্স ময়দানে টেবিল পাতো। ওখানে সবার সামনে আত্মসমর্পণ হবে।'

তাঁরা যখন তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে জিপে করে রেসকোর্স ময়দানের দিকে রওনা হলেন, তখন রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজার মানুষ স্লোগান দিচ্ছে, 'জয় বাংলা'। তাঁদের চোখে অশ্রু, মুখে হাসি। আহ, মুক্তি। আহ স্বাধীনতা।

ঢাকার রেসকোর্স ময়দান। ডিসেম্বরের বিকেলে হঠাৎই কনে-দেখা আলো ফুটে উঠেছে। জেনারেল নিয়াজি আর তাঁর সঙ্গী-সাথিরা মুখ হাঁড়ি করে উপস্থিত। হলুদ রোদ পড়ে সেই মুখ বীভৎস দেখাচ্ছে। কোমরের বেল্ট খোলা, গায়ের শার্টও কোমর থেকে বের করে ঝোলানো অবস্থায় তাঁরা এসেছেন সেখানে।

একটা টেবিল জোগাড় করে আনা হয়েছে। সেই টেবিলে বসে টাইগার নিয়াজি স্বাক্ষর করবেন নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের। তাঁর হাতে কলম দেওয়া হলো। তিনি সাইন করছেন। কিন্তু লেখা ফুটছে না। কালি বেরোচ্ছে না। এই কলম কলকাতা থেকে কিনে আনা হয়েছে। তিনবার ঝাড়ার পর কালি বেরোল। নিয়াজি স্বাক্ষর করতে করতে বললেন, 'যখন কালি আটকে রাখতে চাই, তখন কলম গলগল করে কালি উগরে দেয়। আর এখন কাজের সময় কলম থেকে কালি বেরোচ্ছে না।' বিজয়ীদের পক্ষে স্বাক্ষর করলেন লে. জেনারেল অরোরা।

নিয়াজি তাঁর রিভলবারটি তুলে দিলেন অরোরার হাতে।

অরোরা বললেন, 'এই সেই বিখ্যাত রিভলবার?'

নিয়াজি বললেন, 'জি।' মনে মনে বললেন, মাথা খারাপ। আমি আমার প্রিয় রিভলবার তোমাকে দেব! এটা আরেকটা। একজন পাকিস্তানি সোলজারের কাছ থেকে এটা কেড়ে নিয়ে এসেছি। এটা জংধরা।

পাকিস্তানি অন্য সৈন্যরাও মাথা নিচু করে মাথার ক্যাপ খুলে অস্ত্র মাটিতে ফেলে দিল। চারদিকে তখন গগনবিদারী স্লোগান—'জয় বাংলা'। সেই জয় বাংলা ধ্বনি ছড়িয়ে গেল বাংলাদেশের লোকালয় থেকে লোকালয়ে, পদ্মা মেঘনা যমুনার জল জয় বাংলা জয় বাংলা বলে উঠল কলকলিয়ে, আকাশে উড়তে লাগল পাখিরা, তাদের কাকলিতে জয় বাংলা, সমস্ত ৫৬ হাজার বর্গমাইল যেন একটা মানুষের মুখ, সেই মুখের দুই চোখে আনন্দাশ্রু, কত ত্যাগের স্মৃতি, কত স্বজন-হারানোর কান্না, সেই কান্না চেপে রেখে দেশটা হেসে উঠছে, মুক্তির আনন্দে, বিজয়ের গৌরবে।

ইন্দিরা গান্ধী তখন ভারতীয় পার্লামেন্টে ঘোষণা দিলেন :

ঢাকা এখন একটি মুক্ত দেশের মুক্ত রাজধানী।

পার্লামেন্টে সবাই চিৎকার করে উঠলেন।

ইয়াহিয়া মদকম্প্র কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, পূর্ব সেক্টরে যুদ্ধবিরতি হয়েছে বটে। তবে পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধ চলবে।

ভারত একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করল পশ্চিম সীমান্তেও।

আমেরিকায় হোয়াইট হাউসে নিক্সন ও কিসিঞ্জার জয়ধ্বনি করে উঠলেন, 'আমরা পাকিস্তানের পশ্চিম অংশকে রক্ষা করতে পেরেছি। এইটা আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় জয়।'

নিক্সন বললেন, 'কী রকম একটা বিজয় অর্জন করলাম আমরা!'

কিসিঞ্জার বললেন, 'এটা সম্ভব হলো আপনার দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে। আপনি সত্যি মহান।'

স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের বিজয়ের আনন্দ মুহূর্তেই থমকে গেল।

তারা আবিষ্কার করল, ঢাকায় এবং সারা দেশে জলা-জংলায় পড়ে আছে মানুষের লাশ। কোনোটা পচা-গলা। কোনোটা তেমন গলিত নয়। তারা আবিষ্কার করল, এই লাশগুলো দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষদের—লেখক, ডাক্তার, প্রকৌশলী, অধ্যাপক, সাংবাদিকদের।

যাঁরা মরে আছেন এই জলাভূমিতে, তাঁদের নামের তালিকা পাওয়া গেল রাও ফরমান আলির ডায়েরিতে। হাতের লেখা রাও ফরমান আলিরই।

পরের দিন ইয়াহিয়া ঘোষণা করলেন, পশ্চিম সেক্টরেও পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি মেনে নিচ্ছে।

তারও পরের দিন ইয়াহিয়া ঠিক করলেন, তিনি আইয়ুব মিলনায়তনে ভাষণ দেবেন সেনা কর্মকর্তাদের উদ্দেশে।

জুতার মালা নিয়ে অফিসাররা তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

তবে জুতা মারলে কম মারা হবে। তাঁকে ছিঁড়েই ফেলবেন অফিসাররা।

ইয়াহিয়া আর গেলেন না সেনাকর্তাদের সামনে। গেলেন সেনাপ্রধান আবদুল হামিদ। অফিসাররা শিস দিলেন, দুয়ো দিলেন। টিটকারি করে, গালিগালাজ করে মিলনায়তন থেকে বের করে দিলেন তাঁকে।

ইয়াহিয়াকে আশ্রয় দেওয়া হলো মাংলা ক্যান্টনমেন্টে। সেখানে যুদ্ধবন্দী সৈনিকদের স্ত্রীরা ঝাড়ু হাতে ঘিরে ধরল তাঁর ঘর। সেখান থেকে চুপটি করে সরিয়ে তাঁকে রাখা হলো খারিয়ানের কাছে বান্নি বাংলা নামের এক জায়গায়।

রাতের বেলা সেখানে নেকড়ে ডাকে।

তাঁর দেখভালের দায়িত্বে নিয়োজিত এক পুলিশকর্তাকে তিনি বললেন, 'এ কোথায় এনে রাখলে আমাকে? রাতে তো নেকড়েরা ঘোরাফেরা করে।'

পুলিশকর্তা বললেন, 'নেকড়েরাও একই কথা বলে। কাকে এনে রেখেছ এখানে। এ তো নেকড়ের চেয়েও ভয়ংকর এক লোক।'

এর মধ্যে ভুট্টো হয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। হামুদুর রহমান কমিশন গঠন করা হয়েছে। ইয়াহিয়াকে মাঝেমধ্যেই নিয়ে যাওয়া হয় কমিশনের সামনে জবানবন্দি দিতে।

হেলিকপ্টারে যান তিনি।

তিনি তাঁর নিরাপত্তা কর্মকর্তা সরদার চৌধুরীকে বললেন, 'আমি হেলিকপ্টারে যাব না। আমাকে গাড়িতে নিয়ে যাও।'

'তা সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'কারণ, রাস্তায় মানুষ আপনাকে দেখলে ছিঁড়ে ফেলবে। মেরে ফেলবে।'

'কেন? আমি কী করেছি?'

'কারণ, ঢাকার পতন। আমাদের সৈন্যরা ভারতে যুদ্ধবন্দী অবস্থায় আছে।'

'এ জন্য আমি দায়ী নই। এ জন্য দায়ী রাজনীতিবিদেরা।'

'জনগণ তা বোঝে না। ওরা মূর্খ।'

'আমি কি এখন গ্রেপ্তার অবস্থায় আছি?'

'না। আপনি নিরাপত্তা হেফাজতে আছেন।'

'তাহলে আমার নিরাপত্তার কথা আমাকে ভাবতে দাও। আমাকে নিয়ে চলো সড়কপথে। আমি রাওয়ালপিন্ডিতে আমার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাব।'

'স্যার, আমি আপনাকে জনগণের রোষ থেকে রক্ষা করতে চাই।'

'কেন। আমি কি নীচু জাতের লোক? আমি কি কারও মেয়েমানুষের পশ্চাদ্দেশে খামচি দিয়েছি?'

পুলিশকর্তা রেগে গেলেন। 'আচ্ছা চলুন, আপনাকে সড়কপথেই নিয়ে যাই।'

গাড়ি চলছে। একটা লেভেল ক্রসিংয়ে রেলগাড়ি যাচ্ছে বলে গাড়ি থামল।

তখনই জনতা দেখে ফেলল যে গাড়িতে ইয়াহিয়া।

তারা ঢিল ছুড়তে লাগল। ঢিল এসে পড়ছে গাড়ির উইন্ডশিল্ডে। এখন কী হবে?

রেলগাড়ি চলে গেল। লেভেল ক্রসিংয়ের গেট খোলা হলো। গাড়ি জোরে চালিয়ে তাঁরা সামনে যেতে লাগলেন। কিন্তু চার দিক থেকে জনতা এসে তাঁদের সামনে যা পেল তা-ই দিয়ে ঢিল ছুড়তে লাগল। কাচ গেল ভেঙে।

ইয়াহিয়া থরথরিয়ে কাঁপতে লাগলেন।

তিনি প্যান্টের ভেতরে পেশাব করে দিলেন ভয়ে।

ভেজা প্যান্টের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'আমাকে কি একবার ফাকরার কাছে নিয়ে যাওয়া যায়? এই নারীটিকে আমি সারা জীবন শুধু কষ্টই দিয়েছি।'

নিক্সন ও হেনরি কিসিঞ্জার তখন পাশাপাশি ইউরিনালে দাঁড়িয়ে। খুব আরাম বোধ হচ্ছে। চাপ হালকা করে দেওয়া মতো আরাম আর কী হতে পারে!

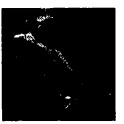

সুলতান জিগ্যেস করলেন, 'আর আর্চার কে ব্লাডের কী হলো? ঢাকার যে মার্কিন কনসাল জেনারেল ভিন্নমত প্রকাশ করে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন?'

শেহেরজাদি বলল, 'আর্চার কে ব্লাডকে তাঁর ভিন্নমত প্রকাশের কয়েক দিনের মধ্যেই ওয়াশিংটনে ডেকে পাঠানো হয়। তাঁকে পররাষ্ট্র দপ্তরের পারসনাল বিভাগের এক কোণে ফেলে রাখা হয় দিনের পর দিন। তাঁর মতো সুশিক্ষিত উজ্জ্বল কূটনীতিকের হওয়ার কথা ছিল রাষ্ট্রদূত। কিন্তু তা তাঁকে হতে দেওয়া হয়নি। কারণ, নিক্সন ও কিসিঞ্জার তাঁর ওপর ছিলেন মহাখাপ্পা। কিসিঞ্জার এর পরে হন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। আর্চার কে ব্লাড ভারতে গিয়েছিলেন এক কনফারেন্সে। তালিকায় কিসিঞ্জার তাঁর নাম দেখতে পান এবং সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দেন তাঁকে ওয়াশিংটনের বাইরে পাঠিয়ে দিতে।

'সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বদলি করে দেওয়া হলো।

'কিসিঞ্জারের দুরাত্মা বহু বছর ধরে আর্চার কে ব্লাডকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। এভাবেই যথাযথ মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি পেশাগত জীবন শেষ করেন। অবসরজীবনে চলে যান লোকচক্ষুর আড়ালে।

'১৯৯৬ সালে হঠাৎ করে বাংলাদেশ থেকে তাঁর ডাক আসে। শেখ হাসিনার সরকার তাঁকে বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে ডেকে নিয়ে যায় বাংলাদেশে। তাঁকে সম্মাননা জানায়। সেই পুরস্কার গ্রহণ করতে বাংলাদেশে আসতে পেরে তিনি খুশি হয়েছিলেন। খুশি হয়েছিলেন বাংলাদেশের উন্নতি দেখেও। আর সবশেষে ঢাকায় আমেরিকান দূতাবাসের লাইব্রেরিটা করা হয় আর্চার কে ব্লাডের নামে। তত দিনে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন।'

'আর শেখ মুজিব?' সুলতান শুধালেন।

শেহেরজাদি বলল, 'শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে বাধ্য হলো পাকিস্তান। তত দিনে ভুট্টো পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী।

দেশে ফিরে এলেন শেখ মুজিব। বাংলাদেশের মানুষের প্রিয় বঙ্গবন্ধু। জাতির জনক। লাখ লাখ লোক চোখে আনন্দাশ্রু নিয়ে তাঁকে বরণ করে নিল স্বদেশের মুক্ত মাটিতে। শেখ মুজিবকে দেখাচ্ছিল অনেকটাই রোগা। দেশের পুণ্যমাটিতে পা রেখে তাঁর প্রিয় স্বদেশবাসীর উদ্দেশে বললেন, 'আমার স্বপ্ন আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার বাংলাদেশ আজ স্বাধীন।' বলেই তিনি কাঁদতে থাকেন।

'বিশ্বকবি তুমি বলেছিলে, "সাত কোটি সন্তানের হে মুগ্ধ জননী,/রেখেছ বাঙালি করে মানুষ করোনি।" বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তুমি দেখে যাও,

তোমার আক্ষেপকে আমরা মোচন করেছি। তোমার কথা মিথ্যা প্রমাণিত করে আজ ৭ কোটি বাঙালি যুদ্ধ করে রক্ত দিয়ে এই দেশ স্বাধীন করেছে। হে বিশ্বকবি, তুমি আজ জীবিত থাকলে বাঙালির বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে নতুন কবিতা সৃষ্টি করতে।

'ইয়াহিয়া খান আমার ফাঁসির হুকুম দিয়েছিলেন। আমি বাঙালি, মানুষ, আমি মুসলমান। বাঙালিরা একবারই মরতে জানে। তাই আমি ঠিক করেছিলাম, আমি তাদের কাছে নতিস্বীকার করব না। ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা। তাদের আরও বলেছি, তোমরা মারলে ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার লাশ বাংলার মানুষের কাছে পৌঁছে দিও। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলে দিতে চাই যে, বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোনো ধর্মীয়ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এ দেশের কৃষক-শ্রমিক, হিন্দু-মুসলমান সুখে থাকবে, শান্তিতে থাকবে।'"

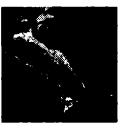

শেহেরজাদি বলল, 'আমার গল্প শেষ। সুলতান, এবার আপনি আমাকে হত্যা করতে পারেন।'

'হ্যাঁ। তোমার বুক বরাবর এবার আমি ছোরা বসাব—' সুলতান শাহরিয়ার বললেন, 'তবে এটা ইস্পাতের ছোরা নয়। এটা আমার হৃদয়ের ছোরা। আমি তোমাকে বিদ্ধ করব আমার হৃদয় দিয়ে। দখল করে নেব তোমার সমস্ত হৃদয়।'

সহায়ক গ্রন্থ

১. *দি আলটিমেট ক্রাইম*, সরদার মুহাম্মদ চৌধুরী, অনুবাদ: মশিউর রহমান মহসিন, অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ২০০২।

২. *দ্য ব্লাড টেলিগ্রাম*, গ্যারি জে ব্যাস, র‍্যানডম হাউস ইন্ডিয়া, ২০১৩।

৩. *ইয়াহিয়া খান ও মুক্তিযুদ্ধ*, মুনতাসীর মামুন, সময় প্রকাশন, ঢাকা, ২০০১।

৪. *সিক্রেট এফিডেভিট অব ইয়াহিয়া খান অন ১৯৭১*, সম্পাদনা: আবু রুশদ, বাংলাদেশ ডিফেন্স জার্নাল পাবলিশিং, ২০০৯।

৫. *দি লাস্ট ডেস অব ইউনাইটেড পাকিস্তান*, জি ডব্লু চৌধুরী, ইউপিএল, ঢাকা, ২০১১।

৬. *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান: জীবন ও রাজনীতি*, সম্পাদক: মোনায়েম সরকার, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৮।

৭. *শেখ মুজিব ট্রায়াম্ফ অ্যান্ড ট্রাজেডি*, এস এ করিম, ইউপিএল, ঢাকা, ২০০৫।

৮. *দ্য মিলিটারি ইন পাকিস্তান, ইমেজ অ্যান্ড রিয়েলিটি*, ব্রিগেডিয়ার (অব.) এ আর সিদ্দিকী, ভ্যানগার্ড বুক পাকিস্তান, ১৯৯৬।

৯. *দ্য ক্রুয়েল বার্থ অব বাংলাদেশ*, আরচার কে ব্লাড, ইউপিএল, ঢাকা, ২০০২।

১০. *একাত্তরে বন্দি মুজিব: পাকিস্তানের মৃত্যুযন্ত্রণা*, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, সূচিপত্র, ঢাকা, ২০১১।

১১. *ইতিহাসের মহানায়ক জাতির জনক*, মোতাহার হোসেন সুফী, অনন্যা, ঢাকা, ২০০০।

১২. *উইটনেস টু সারেন্ডার*, সিদ্দিক সালিক, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯৭।

১৩. *জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫ থেকে ৭৫*, অলি আহাদ, খোশরোজ কিতাব মহল, ঢাকা, ২০০২।

১৪. *দ্য বিট্রেয়াল অব ইস্ট পাকিস্তান*, লে. জে. এ এ কে নিয়াজি, অনুবাদ ডা. মিজানুর রহমান কল্লোল, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০০৮।
১৫. *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান*, সিরাজ উদদীন আহমেদ, ভাস্কর প্রকাশনী, ২০০১।
১৬. *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, এম এ ওয়াজেদ মিয়া, ইউপিএল, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০০।
১৭. *ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু*, সম্পাদক : নুহ আলম লেনিন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ২০১১।
১৮. *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, মাযহারুল ইসলাম, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০২।
১৯. *আ স্ট্রেঞ্জার ইন মাই কান্ট্রি*, মেজর জেনারেল (অব.) খাদিম হোসেন রাজা, ইউপিএল, ঢাকা ২০১২।
২০. *বাংলাদেশের জন্ম, রাও ফরমান আলী*, অনুবাদ : শাহ আহমদ রেজা, ভূমিকা : মুনতাসীর মামুন, ইউপিএল, ঢাকা, ২০০৯।
২১. *পাকিস্তান যখন ভাঙল*, লে. জে. গুল হাসান, অনুবাদ : এটিএম শামসুদ্দীন, ইউপিএল, ঢাকা, ১৯৯৬।
২২. *পাকিস্তানীদের দৃষ্টিতে একাত্তর*, সম্পাদনা : মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমেদ, ইউপিএল, ঢাকা, ২০১৪।
২৩. *১৯৭১ : বন্ধুর মুখ শত্রুর ছায়া*, হাসান ফেরদৌস, প্রথমা, ঢাকা, ২০১২।
২৪. 'দুই খানের গল্প নয়, দুই দেশের গল্প', হামিদ মির, *প্রথম আলো*, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৬।
২৫. 'গুড সোলজার ইয়াহিয়া খান', *টাইম*, ২ আগস্ট ১৯৭১।
২৬. 'দ্য রোমিও জেনারেল অ্যান্ড দ্য থ্রি পিকচারস', ড. আসিফ জাভেদ, পাকিস্তান লিংক। (অনলাইন)
২৭. হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট (অনলাইনে যা পাওয়া গেছে)
২৮. 'দ্য হিস্ট্রি ইজ আনফরগিভিং', পাকিস্তান অবজারভার (অনলাইন), ২২ মে ২০১১।
২৯. 'দ্য ফ্যাসিনেটিং টেল অব জেনারেল রানি', দ্য ফ্রাইডে টাইমস (অনলাইন), ২৮ মার্চ ২০১৪।
৩০. 'নাইটস অব দ্য নাইটস', হামদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট, ডিফেন্সপিকে (অনলাইন)।

৩১. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, দলিলপত্র*, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার।

৩২. সারেন্ডার এট ঢাকা : বার্থ অব এ নেশন, লে. জে. এফআর জ্যাকব, ইউপিএল, ১৯৯৭।

৩৩. আরও কিছু অনলাইন ব্লগ, বিভিন্ন পত্রিকার অনলাইন সংস্করণ।